আগন্তুক

আহম্মাদ মোস্তফা কামাল

উপন্যাস

রচনাকাল: মে,২০০০ – নভেম্বর,২০০১

আমাদের বাড়ির পুকুরটা ভরতি ছিলো বঁচুরিপানায়। আমরা কি করতাম জানো? টাপা নিয়ে– টাপা চেনো তো, ওই ধামার মতো আর কি – টাপা বা ধামা কোনোটাই চেনার কোনো লক্ষণ শ্রোতার এক্সপ্রেশনে দেখতে না পেয়ে বক্তা এবার হাত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে জিনিসটা কি রকম– বাঁশের তৈরী বুঝেছো, মুরগি ঢেকে রাখতো।

বাড়ির পুকুর থেকে টাপা ও ধামা হয়ে মুরগিতে এসে ঠেকলে বর্ণনাটি ঠিক কোনদিকে টার্ন নেবে ঠাহর করা যায়না। তবে ভরসার কথা, অচিরেই আবার বাড়ির পুকুর ফিরে আসে – তো, আমরা ওই টাপা দিয়ে হাঁটু বা কোমর পানিতে নেমে বঁচুরিপানা তুলতাম। তারপর ডাঙায় এনে বঁচুরিপানাগুলো ফেলে দিলে দেখা যেত, অনেকগুলো কৈ মাছ খলবল খলবল করছে। ইয়া বড়ো বড়ো। আর এগুলো– পাতের থেকে কৈ মাছ তুলে নিয়ে সে বলে– এগুলো তো ওগুলোর বাচ্চা মাত্র।– একটু অবিশ্বাসের ভাব মনের মধ্যে এলেও শান্তা মারিয়া, ওরফে শান্তা, স্বামী অঞ্জন হায়দার চৌধুরী, ওরফে, অঞ্জনকে তা বুঝতে না দিয়ে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে– সত্যি? তুমি নিজের হাতে মাছ ধরেছো?– হ্যাঁ, শুধু আমি বেন, বুবু, আপুনি, আপা সবাই।– অর্থাৎ তিন বোনের কথাও এসে গেলো। অবশ্য বাড়ির কথা যখন উঠে পড়েছে তখন ঘণ্টাখানেকের আগে এই প্রসঙ্গ শেষ হবে না এবং শান্তাকে আগ্রহ ভরে তা শুনতেও হবে। সব সময় শুনতে ভালো লাগে না, তবে ইয়া বড়ো বড়ো কৈ মাছ ধরার এই তথ্যটি নতুন। সম্ভবত আগে কখনো ব্যাপারটি মনে পড়েনি, এখন কৈ মাছ খেতে বসে প্রসঙ্গটি এসে পড়েছে। অঞ্জনের ভান্ডারে অবশ্য এ রকম অনেক গল্প এবং এক গল্প সে পারতপক্ষে দ্বিতীয়বার বলে না। একজন মানুষ যে তার গ্রাম নিয়ে এত কথা বলতে পারে, কাছ থেকে না দেখলে শান্তা কখনো তা বিশ্বাস করতো না। যেন তার সমস্ত কিছু জুড়ে আছে ওই গ্রাম। আশ্চর্য! বিয়ের ছ মাস যেতে না যেতেই অন্তত হাজারখানেক গল্প শোনা হয়ে গেছে শান্তার। প্রথম প্রথম খুব মজা লাগতো। সব মেয়েই বোধ হয় স্বামীর শৈশব কৈশোরের গল্প শুনতে পছন্দ করে। শান্তার শ্বশুর-শাশুড়ী নেই। এইসব গল্প তো শাশুড়ীদের কাছ থেকেই শোনা যায়– যতো বিরোধিই থাক বউরা তাদের শাশুড়ীদের কাছ থেকে স্বামীর ছোটবেলার গল্প খুব মনোযোগ দিয়েই শোনে– শান্তার ভাগ্যে সেটা নেই। বলার মধ্যে আছে ওই তিন বোন – তা, তারা তো সময়ই পায় না; নিজেদের সংসার নিয়েই মহা ব্যস্ত। সব অভাব তাই অঞ্জনকে একাই পুরণ করতে হচ্ছে। এক সময় অবশ্য একটু বিরক্তি তৈরী হয়েছিলো। অঞ্জনের বর্ণনা যতোই প্রাণবন্ত হোক, ওইসব স্মৃতি তার কাছে যতই মধুর কিংবা গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন– শান্তার সঙ্গে তো তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ অনেকটা অচেনা বিয়ে বাড়ির ভিডিও বা স্থির চিত্র দেখার মতো। সেই ছবির প্রতিটি মানুষের অঙ্গভঙ্গি কি চালচলন কি কথাবার্তা পরিচিত একজনের কাছে যতই মজাদার মনে হোক না কেন, ওই বিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কারো কাছে তার গুরুত্ব কোথায়? সে হয়তো সাজসজ্জা দেখে বর-কনেকে চিহ্নিত করতে পারবে, কিন্তু বরের শালী কি কনের দেবর কি শ্বশুর-শাশুড়ী কি আত্মীয়-স্বজনকে চিহ্নিত করার উপায় কি? শান্তার

অবস্থা অনেকটা এ রকমই। সেইসব স্মৃতির পাত্র-পাত্রীদের চেনা যাচ্ছে– যেমন, অঞ্জন বা তার বোনেরা– কিন্তু অন্য সবকিছুই তো অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে– এমনকি ওদের বাড়িটা পর্যন্ত অচেনা, ওই বাড়িতে আজ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি শান্তার; ফলে পুরো ব্যাপারটিই তাকে নিতে হয় কল্পনা করে। তাছাড়া, অঞ্জন আমেরিকায় ছিলো প্রায় ১২ বছর, অথচ সেখানকার গল্প করেছে সামান্যই; কিন্তু প্রতিদিনই দু চারটে করে গ্রামের গল্প না করলে তার চলে না। একবার শান্তা জিজ্ঞেস করেছিলো –

আচ্ছা, আমেরিকায় গিয়েও কি তুমি উদাসপুরের গল্প করতে? বিয়ের আগে তোমার এত গল্প শুনতো কে?

না গল্প আর করতে পারতাম কোথায়! দু-চারজন যা বন্ধুবান্ধব জুটেছিলো, তাদের কাছে এগুলো বলাই যেত না। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতো। আমেরিকা তো ওদের কাছে স্বর্গ। স্বর্গে গিয়ে কে আর পাড়াগাঁর গল্প শুনতে চায়! ওরা আমাকে ওখানকার সোসাইটির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে বলতো। আমি আর তা পারলাম কই, শেষ পর্যন্ত তো ফিরে আসতেই হলো... বলতে বলতে থেমে গিয়ে যেন হঠাৎ মনে এমন ভঙ্গিতে – কেন শান্তামণি তোমার কি এসব শুনতে খারাপ লাগে? – করুণভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করলে শান্তার ভারি খারাপ লাগে। আহা, লোকটা গ্রামের কথা বলতে এত ভালোবাসে, হয়তো এর পেছনে কোনো অজানা কারণ আছে, শুধু শুধু কেন বিরক্তি প্রকাশ করলাম! ও তো আর অন্যায় কিছু করছে না! তাছাড়া অঞ্জনের কথা বলার ভঙ্গিটিও ভারি সুন্দর। খুব সাজিয়ে গুছিয়ে, অলংকার-টলংকার দিয়ে কথা বলে; যেন কোনো সুখপাঠ্য গল্প বা উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছে। ওর কথা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। সে দেখতে সুদর্শন, আবার মানুষ হিসেবেও খুব ভালো, উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, স্বচ্ছল, রুচিশীল। সব মিলিয়ে সে তো স্বপ্ন-পুরুষের মতোই। তাকে নিয়ে শান্তার তেমন কোনো অপূর্ণতা নেই। একজন মানুষ শুধু তার গ্রামের গল্প করে বলে, ফেলে আসা শৈশবে মগ্ন থাকে বলে বিরক্ত হওয়া অনুচিত। শান্তা তাই আর কোনোদিন বিরক্তি প্রকাশ করেনি, বরং আগ্রহই দেখিয়েছে। অঞ্জন যে কোনো কারণেই হোক এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। বোনরা এলেও সে একটা না একটা প্রসঙ্গ তুলবেই–

তোর মনে আছে বুবু, [সবচেয়ে ছোট বোনটিকে সে ডাকে বুবু, মেজটিকে আপুনি, আর বড়জনকে আপা] আমি সরাসরি গিয়ে ক্লাস টু-তে ভর্তি হলাম উদাসপুর সরকারী প্রাইমারি স্কুলে! প্রথম প্রথম স্কুলটা যে কি জিনিস তাই তো বুঝতাম না। আমাদের হেডস্যার আব্দুল লতিফের কথা তোর মনে আছে না? তো, একদিন ওই স্যার পড়াচ্ছিলেন – *আমি আজ কানাই মাস্টার, পড় মোর বিড়াল ছানাটি* – পড়াতে পড়াতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কানাই মাস্টারটি কে? কেউ উত্তর দিচ্ছে না। উত্তরটা আমার জানা, মা তো বাড়িতে আগেই এগুলো পড়িয়ে ফেলেছেন – মা পড়াশোনায় আমাদেরকে সবসময় স্কুলের পড়ার চেয়ে এগিয়ে রাখতেন, তাই না? – কিন্তু আমি তখনও জানিই না যে, স্যার এভাবে কিছু জিজ্ঞেস করলে যে কোনো একজন উত্তর দিলেই হয়। আমাকে তো আর জিজ্ঞেস করেননি, ভেবে চুপ করেই আছি, আর তাকিয়ে আছি স্যারের পেছনে জানালার দিকে। সেখানে গ্রিল ধরে তুই, আপুনি আর মিরা আপা দাঁড়ানো। তুই মুখ গোল করে খোকা খোকা বলছিলি। তুই যে স্যারের প্রশ্নের উত্তর বলে দিচ্ছিস, আমি তা বুঝতেই পারিনি। তোরা তো আমাকে

খোকা বলেই ডাকতি; আমি ভাবছিলাম – তুই স্যারের সামনে আমাকে ডাকাডাকি করছিস কেন, উত্তর নেয়াটা কি ঠিক হবে? হা হা হা ...। তারপর একটু থেমে, একটু বিষণ্ন হয়ে – জানিস বুবু, জীবনে আমি যতবার বিভিন্ন জায়গায় কোনো প্রশ্নে আটকে গেছি, মনে হয়েছে, আহা, তোর মতো কেউ যদি অমন করে আমাকে উত্তরটা বলে দিতো! আবার কতবার যে জানা প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারিনি, বা দেওয়া হয়নি, বা দিতে গিয়ে থেমে গেছি, থামতে থামতে অচল অথর্ব হয়ে গেছি, তখনও আমার মনে হয়েছে, যদি কেউ তোর মতো করে উত্তরগুলো বলে দেয়ার জন্য ওভাবে পেছন থেকে প্রেরণা দিতো!

কিংবা–

তোর যে কয়েকটা হাঁস ছিলো, মনে আছে আপুনি? সন্ধ্যা হয়ে এলে তুই সেই হাঁসগুলোকে ডেকে ডেকে বাড়ি ফেরাতি। সেই ছোটবেলায় আমাদের বইতে একটা কবিতা ছিলো না – *সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো বেলা গেলো ওই, কোথা গেলি হাঁসগুলি তৈ তৈ তৈ!* – এই কবিতার সঙ্গে তোর হাঁস আর তুই একাকার হয়ে গিয়েছিলি। সন্ধ্যায় তুই যখনই হাঁসগুলোকে ডাকতি, আমার ওই কবিতার কথা মনে পড়তো। পরে, বড় হয়ে, আমার মনে হয়েছে, তুই যেন ওই কবিতা থেকে উঠে আসা একটি চরিত্র ছিলি। সেই দৃশ্য আজও আমার চোখে লেগে আছে – বর্ষার থৈ থৈ পানিতে আপাত নিরুদ্দেশ হাঁসগুলোকে তুই ডেকে ডেকে বাড়ি ফেরাচ্ছিস – এই দৃশ্য যেন অমরতা পেয়ে গেছে আমার কাছে। আরো পরে, যখন আমি আমেরিকায় কিছুতেই অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না, তখন আমার মনে হতো – অমন মমতা নিয়ে যদি একবার কেউ আমাকে ডাকতো, আমি একছুটে উদাসপুর চলে যেতাম। সেই যে কবে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি, তেমন করে আর ফেরার ডাক পেলাম না বলে আমার আর ফেরাই হলো না রে আপুনি!

অথবা–

তুমি যে আমাকে হাতের লেখা শেখাতে, তোমার মনে পড়ে আপা? একটা সাদা কাগজে সুন্দর করে রুল টেনে, সেটাকে আবার দু ভাগে ভাগ করে – একভাগে রুলের ভেতরে সুন্দর করে লিখতে, অন্যভাগে একই বাক্য লিখতে একটু অন্যভাবে – অক্ষরগুলো যেতো বেঁকেচুরে, রুলের বাইরে চলে যেতো মাথাগুলো। তুমি এই ভুলভাগে একটা বড় ক্রসচিহ্ন এঁকে লিখতে ভুল । আর শুদ্ধভাগে পড়তো টিকচিহ্ন। লিখতে শুদ্ধ । তারপর কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলতে – এভাবে লিখবি – অর্থাৎ ক্রসচিহ্ন আঁকা অংশটা ভুল, ওভাবে লেখা যাবেনা, লিখতে হবে টিকচিহ্নওয়ালা শুদ্ধ অংশের মতো করে। তোমার মনে পড়ে না আপা এসব কথা? আমার কতবার যে মনে হয়েছে – জীবনের ভুলগুলো যদি কেউ অমন বড়ো একটা ক্রসচিহ্ন এঁকে দিয়ে বলতো – ভুল'। তারপর কোথাও একটা টিকচিহ্ন। একটা উজ্জ্বল টিকচিহ্নের জন্য আমি কত দিন ধরে অপেক্ষা করে আছি আপা, নেই, কোথাও নেই। – বলতে বলতে হয়তো অঞ্জনের চোখ ভিজে ওঠে, আর শান্তা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। এই লোকটির কোনো থৈ পাওয়া যাচ্ছে না। যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন দুর্বোধ্য, জটিল আর রহস্যময় হয়ে উঠছে তার সবকিছু। কি ভুল, কোথায় ভুল তার? কেন তার একটি বড় ক্রসচিহ্ন প্রয়োজন? একজন আপাদমস্তক সফল মানুষ, বহু মানুষের ঈর্ষার পাত্র হওয়ার সকল যোগ্যতা যার

বয়সজনিত, একটি উজ্জ্বল টিকচিহ্নের জন্য তার কেন এমন ব্যাকুল প্রতীক্ষা? তার এত কিসের দুঃখ? শান্তা এতকিছু বোঝে না, কিন্তু এটুকু বোঝে, দুঃখী মানুষরাই এমন নস্টালজিক হয়। বর্তমান থেকে মুখ ফিরিয়ে, ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করে, কেবল অতীতের সুখ-স্মৃতির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চায়। শান্তার কাছে স্বামীর এত নস্টালজিয়ার কারণটি বরাবর অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। কিন্তু সে তো বুঝতে চায়, জানতে চায় – কেন অঞ্জনের মতো এমন আপাতদৃষ্টিতে সামাজিকভাবে সফল একজন মানুষ কেবল শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাচ্ছে। একজন ব্যর্থ লোকের জন্য শৈশব-কৈশোর আঁকড়ে থাকাটা মানিয়ে যায় – এ ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই বলে – অঞ্জনকে তো ঠিক সেই দলে ফেলা যায় না। সব মানুষের কাছেই তার ছোটবেলার স্মৃতি অসম্ভব প্রিয় একটি বিষয় – শান্তা তা জানে, বোঝে; এমনকি তার নিজের ক্ষেত্রেও তাই – তাই বলে কেউ এমন করে, কেবল ওই স্মৃতিকেই অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে পারে, এটা সে ভাবতেই পারে না। অঞ্জন যেন আক্রান্ত হয়ে আছে, শান্তার মাঝে মাঝে ভয় হয় – এই অসম্ভব স্মৃতিকাতরতা শেষ পর্যন্ত ওকে কোথায় নিয়ে যাবে? একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জীবন কি ও যাপন করতে পারবে? এইসব ভাবনা শান্তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে মাঝে মাঝে, গভীরভাবে অঞ্জনের এইসব বিষয়-আশয় বুঝে নিতে চায়। বুঝতে পারে না বলে বোনদের জিজ্ঞেস করার কথা ভাবে। কিন্তু বোনরাও সম্ভবত এসব থেকে তাদের ভাইকে একটু দূরেই রাখতে চায়। এই শৈশব-কৈশোরচারণ আর তার সঙ্গে বর্তমানকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার অবস্থায় পড়ে বোনেরা স্নেহের হাসি হাসে –

তোর এত কিছু মনে থাকে কি করে রে খোকা?

থাকবে না? তোমরাই তো বলো, আমি খুব ব্রিলিয়ান্ট।

ব্রিলিয়ান্টই তো। তুই হচ্ছিস আমাদের হিরের টুকরো ভাই। পৃথিবীতে এরকম ভাই ক টা বোনের থাকে? তা বউটা কেমন পেয়েছিস? জ্বালায় নাকি খুব?

শান্তা বুঝতে পারে – খুব কৌশলে প্রসঙ্গগুলোকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। অঞ্জন হা হা করে হাসে –

আরে না, আমার জ্বালায়ই ওর জীবন অতিষ্ট, আমাকে আর জ্বালাবে কখন? তাই না শান্তামণি?

শান্তা আর কি বলবে? যা-ও বা বলতো, সবার সামনে আহ্লাদ করে শান্তামণি ডেকে তা-ও ভন্ডুল করে দিলো। তো, অঞ্জনের এই ধরনের কথা শুনলে শান্তার কষ্ট হয়। বুঝতে পারে – সবসময় একই বিষয় নিয়ে গল্প করে বলে অঞ্জনের ভেতরে বিরক্তবোধ আছে। শান্তা কোনোভাবেই সেটা দূর করতে পারেনি। ঐ একদিনের একটি কথা থেকেই ও ভেবে নিয়েছে, এসব বিষয়ে শান্তার কোনো আগ্রহ নেই; স্রেফ বাধ্য হয়ে শোনে। কিন্তু এসব শুনে শুনে যে শান্তার একটা লাভও হয়েছে, অঞ্জনকে তা কে বোঝাবে? উদাসপুর গ্রাম, পদ্মা আর ইছামতি নদী, শীতের সকাল ও সন্ধ্যা, গরমে পা পুড়ে যাওয়ার মতো বালুময় পদ্মার পাড়, বর্ষায় উঁচু পাড় থেকে পদ্মায় ঝাঁপিয়ে পড়া, কি নতুন আসা পানিতে ডুবে যাওয়া মাঠে গাড়া বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে থাকা স্বামীর কচি মুখটি যে তার একরকম চেনাই হয়ে গেছে, সে তো এই বর্ণনার গুণেই। ওখানকার একটা বড়সড় বর্ণনা

বোধহয় সে এখন নিজেই দিয়ে দিতে পারবে। এ কি কম কথা? একটি অদেখা-অচেনা পরিবেশ-প্রবৃত্তিকে কল্পনায় ধরে ফেলা যায় যে বর্ণনায় তাকে কি হেলাফেলা করা যায়?

২

অঞ্জন যে এত কথা বলে, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে – নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে তার মুখে খুব বেশি কিছু শোনা যায়নি। এখানটায় শান্তার একটু ফাঁক রয়ে গেছে, কিন্তু সে যে খুব বড় ঘরের ছেলে, সেটা বিয়ের আগেই জেনেছিলো শান্তা। যে কোনো বিয়ের প্রস্তাব যেতে তার বুড়ো দাদা – পাথপঞ্চের চৌদ্দপুরুষের খোঁজখবর না করে যিনি নাতনীর বিয়ে দেবেন না বলে পণ করেছিলেন এবং এরের পর এক প্রস্তাব বংশমর্যাদা না থাকার অজুহাতে অবলীলায় নাকচ করে বাবার মুখ ক্ষমাগত মলিন করে দিচ্ছিলেন, এই প্রস্তাবেও যথারীতি বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন –

ছেলের বাড়ি কই?

মানিকগঞ্জ।

মানিকগঞ্জ তো বুঝলাম – কোন থানা, কোন গ্রাম? মানিকগঞ্জে ভদ্রলোক তো হাতে গোনা কয়েকজন!

আপনি ওদের চেনেন আব্বা। পাশ উদাসপুরের মোফাজ্জল আহমদ চৌধুরীর নাতি।

বলিস কি! মোফাজ্জল সাহেবের নাতি? মানে টুটুন ভাইয়ের ছেলে?

হ্যাঁ, আব্বা।

আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার দাদুর কপাল খুলে দিয়েছেন। তুই মত দিয়ে দে।

খোঁজখবর না করেই ... মানে ছেলে কেমন ...

ওগুলো জানার দরকার নেই। যার বাপ দাদা এত ভালো মানুষ, সে খারাপ হতে পারে না। ওদের রক্ত বিশুদ্ধ। তোরা তো চিনিস না, জানিসও না, ওরা ঠিক সাধারণ মানুষ নন। টুটুন ভাইকে তো আমি বরাবর মহামানব জেনে এসেছি। তার ছেলে আমার নাতনী জামাই হবে, আল্লাহর কাছে হাজার শোকর।

এরপর দাদা দীর্ঘ গল্প ফাঁদলেন। বুড়ো বয়সে দাদার গল্প করার প্রবণতা বেড়েছে, বেন্ড-ই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শোনে না। কিন্তু এবার বাবা গভীর মনোযোগ দিলেন। আফটার অল মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন তো! গল্প অঞ্জনের দাদা ছেড়ে ওর বাবা – অর্থাৎ শান্তার দাদার কাছে টুটুন ভাই – হায়দার আহমদ চৌধুরীতে এসে পড়লো।

টুটুন ভাই কত স্কলার মানুষ ছিলেন। সেই ব্রিটিশ আমলে অনার্স করলেন, মাস্টার্স করলেন দু-বার, আইসিএস-এ কত বড়ো কৃতিত্ব দেখালেন। তখন তো বাঙালি মুসলমানরা স্কুলের গণ্ডি পেরোতেই হিমশিম খেতো, আর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পেরিয়ে গেলেন, পুরো মানিকগঞ্জ মহকুমায় এতটা কৃতিত্বের

অধিকারী আর বেশি ছিলো না। এমন কি সারা দেশেও তাঁর মতো স্কলার লোক – অন্তত মুসলমানদের মধ্যে – খুব বেশি দেখা যেত না। সবাই তাঁকে একনামে চিনতো। আমাদের দুর সম্পর্কের আত্মীয় তাঁরা, অথচ তাই নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত ছিলো না। আমি তো শুধু তাঁর কথা শোনার জন্যই ওই বাড়িতে যেতাম। তোরা তো এখন শুধু সারভাইভ করার জন্য হা পিত্যেশ করে মরিস, অথচ উনি এত বড় চাকরি, স্ট্যাটাস, সম্ভাবনা সব ছেড়ে গ্রামে চলে গেলেন। সাধুসন্ত না হলে কেউ এমন করতে পারেন? তাকে দেখে কিছু বোঝা যেত না, তুইও তো দেখেছিস, মনে হয়েছে যে লোকটা এমন অসাধারণ? তার ওই গ্রামে চলে যাওয়া নিয়ে কত কথা, কত জল্পনা কল্পনা! আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম – কেন তিনি এমনটি করলেন। তিনি বলতেন – আমার সন্তানরা বড় হচ্ছে। আমার তো বদলির চাকরি, আজ এখানে আছি তো কাল ওখানে। এতে ওদের কোনো শেকড় গজাবে না। ওদের শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি বলতে নির্দিষ্ট কিছু থাকবে না। ওরা ওদের অরিজিনের কথা জানতেই পারবেনা – সন্তানদের শেকড় তৈরীর জন্য, অরিজিন চেনানোর জন্য যে লোক অত বড় চাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে যায়, তার ছেলে কেমন হবে, তুই বুঝিস না, গাধা কোথাকার ...

দাদার এইসব গল্প চলতেই থাকলো। যাকেই পান তাকেই শুনিয়ে দেন – আমার দাদুমনির বিয়ে দিচ্ছি কোথায় জানো? মোফাজ্জল আহম্মদ চৌধুরীর নাতি, হায়দার আহম্মদ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে অঞ্জন হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে। তারপর দীর্ঘ গল্প। এইসব গল্পের ধরন দেখে মনে হয় – এই চৌধুরীরা জাতীয় পর্যায়ে কতই না গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিত্ব। অথচ তাঁদেরকে কে-ই বা চেনে? শান্তার দাদা অবশ্য এইসব ভাবেন না। বিপুল উৎসাহে তিনি তাঁদের গৌরব গাঁথা বলতে থাকেন। অনেকদিন শান্তাকে ডেকেও সেসব কথা শুনিয়েছেন।

বুঝলি দাদুমনি, ওরা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষেই খানদানী বংশের লোক। সব খানদানী অবশ্য উৎকৃষ্ট হয় না, খুব ভালো ধানেও যেমন কিছু চিটা থাকে, অনেক খানদানী বংশেও তেমন বখে যাওয়া কিছু মানুষ থাকে। কিন্তু ওদের বংশটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেন জানিস? এই বংশের প্রতিটি পুরুষে ছেলের সংখ্যা মাত্র একজন। যেমন অঞ্জন তার বাবার একমাত্র ছেলে, তেমনি হায়দার আহম্মদ সাহেবও তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে, মোফাজ্জল সাহেবও তাই। আমি তাঁদের পুর্বপুরুষদের ইতিহাস যতটুকু জানি – সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটি একই রকম। অদ্ভুত না? কিন্তু এটা প্রধান বিষয় নয়, প্রধান বিষয় হচ্ছে – এইলোকগুলো বংশ পরম্পরায় তাঁদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তাঁদের নানান কীর্তি মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। যেমন ধর, টুটুন ভাইয়ের দাদা, মানে তোর শ্বশুরের দাদার কথা বলছি [শান্তার তখনো বিয়ে হয়নি কিন্তু দাদা অবলীলায় তার হবু বরের বাবাকে শ্বশুর বলে সম্বোধন করতে দেখে শান্তা হাসতে গিয়েও চেপে যায়], উনি কি একটা কারণে ব্রিটিশ সরকারের দেয়া 'খান বাহাদুর' উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, এজন্য তিনি ব্রিটিশদের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। ঘটনাটা আমি ঠিক জানি না, শুধু একটু একটু মনে পড়ে, আমার দাদা আত্মীয়তার সুত্র ধরে গর্ব করে লোকজনদের বলতেন – দেখেছো আমার ভাই গোলাম আহম্মদ চৌধুরী ব্রিটিশদের কেমন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়েছে! তো এটা গেলো গোলাম আহম্মদ চৌধুরীর কথা – তাঁর ছেলে মোফাজ্জল আহম্মদ চৌধুরীও কম যান না। উত্তরাধিকারসুত্রে পাওয়া জমিদারি তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। এমনিতেও জমিদার বলতে আমাদের

সামনে যেমন একটা অত্যাচারী বীভৎস রূপ ফুটে ওঠে, তাঁরা তা ছিলেন না। জোর করে খাজনা আদায় করা, কারণে-অকারণে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করা – এসব বদনাম তাঁদের সম্বন্ধে খুব একটা শুনিনি। বরং প্রজাদের প্রতি নানারকম সহানুভূতির কাহিনীই বেশি শোনা যেত। এমনকি তাঁরা যে ঠিক প্রচলিত ঢঙের জমিদার ছিলেন না সেটা তাঁদের বাড়ি দেখলেও বোঝা যায়। বড় বাড়ি, কিন্তু সেখানে কোনো দালান নেই, পুরোটাই সাধারণ টিনের ঘর। তো, মোফাজ্জল সাহেব নিজের মতো করে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করলেন, গ্রামবাসীদের বললেন – তোমরা আমার জমি চাষ করে ফসলের অর্ধেক দেবে, বাকি অর্ধেক তোমাদের। জমিদারের কাছ থেকে এরকম অভিনব ঘোষনা ঐ অঞ্চলের সাধারণ গরীব-দুঃখী মানুষদের জীবনযাত্রাই পাল্টে দিয়েছিলো। তিনি তাঁর জমিতে শুধু স্বচ্ছল চাষীদেরই নয়, ভূমিহীন দরিদ্র চাষীদেরও কাজ করার জন্য ডাকতেন। প্রয়োজনে হালের বলদ, বীজ ইত্যাদি দিয়ে তাদের সাহায্যও করতেন। অবশ্য এসব আমি দেখিনি, কেবল শুনেছি, কিন্তু নিজের চোখে যা দেখেছি সেটা হলো তাঁর পলিটিক্যাল স্ট্যান্ডপয়েন্ট – ওই সময়ের জন্য যা বেশ ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা ছিলো। তোর শ্বশুরের মতোই তিনিও ছিলেন খুব উচ্চ শিক্ষিত মানুষ, তবে তাঁর শিক্ষাটা ছিলো ধর্মীয় লাইনে। বিরাট আলেম ছিলেন, প্রচুর জানতেন, এবং ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর কথা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করতো। ধর্ম নিয়েও যে এমন অসামান্য দার্শনিক আলোচনা করা যায়, তাঁর কথা না শুনলে সেটা আমার অজানাই থেকে যেতো। তো, উনি সারা দেশ ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, ধর্মের কথা বলতেন, ধর্মের দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন, সেই সঙ্গে বলতেন অধিকার প্রতি ার কথা। দেশ জুড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো একজন ধর্মীয় চিন্তাবিদ হিসেবেই। তিনি যে পলিটিক্স করতেন, সেটা প্রায় ঢাকাই পড়ে গিয়েছিলো তাঁর ওই পরিচয়ের আড়ালে। কারণ, এদেশের মানুষ তার পলিটিক্যাল ভিউটা বুঝতেই পারেনি। তিনি ছিলেন অল ইন্ডিয়া ওলামায়ে হিন্দ – এর অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা। ইতিহাস বলে, যে, তাঁরা কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন, কিন্তু উনি নিজে সেটা স্বীকার করতেন না। একটা ঘটনা তোকে বলি। ভারত ভাগের কয়েকবছর আগের কথা। শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেব এলেন মানিকগঞ্জে। এর কিছুদিন আগেই তিনি লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, সেটা আবার পুরোপুরি গৃহীত হয়নি। উনি তখন পাকিস্তানের পক্ষেই ক্যাম্পেন করছেন। মানিকগঞ্জেও বিশাল জনসভা হলো – দুর-দুরান্তের মানুষ হক সাহেবকে দেখতে ছুটে এসেছে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করলেন মোফাজ্জল সাহেব। তিনিও খুব জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তো, সভায় পাকিস্তানের পক্ষে অনেক নরম গরম বক্তৃতা হলো। জনগণ উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত। সেই পরিস্থিতিতে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে মোফাজ্জল সাহেব যা বললেন, আমি আমার জীবনে শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণ ছাড়া এমন সাহসী বক্তৃতা আর কখনো শুনিনি। আমি তখন ১৭/১৮ বছরের যুবক, রক্তে পাকিস্তানের নেশা লেগেছে। আর সেই মুহূর্তে হক সাহেবকে সামনে রেখে মোফাজ্জল সাহেব বললেন – হক সাহেব, আমি আপনার লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। এমন কি আমি পাকিস্তানের কনসেপ্টও গ্রহণ করিনি। তাই বলে আমাকে আবার কংগ্রেসী ভাববেন না, ওরাও আপনাদের মতোই ধান্দাবাজ, জনগণকে জিম্মি করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। এত বুদ্ধি আপনার হক সাহেব – জনগণ ভালোবেসে আপনাকে শেরে বাংলা নাম দিয়েছে –

সেই আপনিই কি না গান্ধি-নেহেরু আর জিন্নাহর ফাঁদে পা দিলেন! এতটুকু বুঝতে পারছেন না যে, রাষ্ট্র ভেঙে গেলে জনগণের শক্তি ও সাহস কমে যায়, জনগণ পিছিয়ে পড়ে! আমিও অবশ্যই নির্যাতিত নিপীড়িত পিছিয়ে পড়া মুসলমান জনগোষ্ঠীর উন্নতি চাই, তাদের সমস্যার সমাধান চাই, কিন্তু তা ভারতবর্ষকে অখণ্ড রেখে। ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে – এটাই কি আপনাদের রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিলো না? আপনারা তা না করে দু টি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তুলছেন এবং জনগণকে বোঝাতে চাইছেন – পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেন? মুসলমানদের দুর্দশার জন্য কি হিন্দুরা দায়ী? দরিদ্র মুসলমানদের মতো দরিদ্র হিন্দুরাও কি নির্যাতিত নয়? তাহলে? আপনারা যে এসব বোঝেন না তা তো নয়, তবু কিভাবে যে আপনাদের মাথায় হিন্দু মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তা এলো আমি তা ভেবে পাই না। শত শত বছর ধরে এই দুই জনগোষ্ঠী একসঙ্গে আছে, আজকে আপনারা বলছেন যে, না একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়! আপনারা কোন সাহসে তাদেরকে আলাদা করতে চান? একটি রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেই এইসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। নিশ্চয়ই সম্ভব। আর তার জন্য আপনার মতো নেতাদের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। আপনারা ভারতকে ভেঙে দু-টুকরো করার অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে পারেন, আর এইসব সমস্যার সমাধান করতে পারেন না, এটা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, হক সাহেব। এই দেশভাগ আসলে আপনাদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এক দেশে থাকলে যদি আপনারা গান্ধী-নেহেরুর কাছে ক্ষমতার দৌড়ে হেরে যান, তাই এই দ্বিজাতিতত্ত্ব আর দেশভাগের ধুয়া তুলেছেন। এর পরিণাম ভালো নয় হক সাহেব। আপনারা যে ব্রিটিশদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন তা-ও বোঝেন না? ওরা আমাদের দ্বিখণ্ডিত করতে চায়, আমাদের শক্তি কমিয়ে দিতে চায়; এই উপমহাদেশের যে অপার সম্ভাবনা আছে, সেটাকে ওরা ধূলিসাৎ করতে চায়। ওদের এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেবেন না – আপনার কাছে আমাদের আলাদা দাবি আছে, এই বাংলায় আপনিই আমাদের একমাত্র নেতা, আপনি ভুল করলে এই জাতি যে ভোগান্তিতে পড়বে তার জন্য আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকবেন, কোনোদিন ক্ষমা পাবেন না।

উপস্থিত জনগণ চুপ করে মোফাজ্জল সাহেবের কথা শুনছিলো – বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর দেখা গেলো – জনমত ঘুরে গেছে। এতক্ষন যারা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বলে চিৎকার করছিলো, তারাই আবার চিৎকার করে বলছে – হুজুর ঠিকই বলেছেন, শেরে বাংলা সাহেব কিছু বলেন। কিন্তু হক সাহেব কিছুই না বলে নীরবে চলে গেলেন। আমরা বুঝে নিলাম – মোফাজ্জল সাহেবেরই জয় হয়েছে। এই নিয়ে অনেক হৈ চৈ হলো, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলো। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে তো আর পাকিস্তান সৃষ্টি কিংবা দেশভাগ ঠেকানো সম্ভব নয়! যথারীতি দেশভাগ হলো, পাকিস্তান হলো, কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষকে মেনে নিতে পারলেন না। দেশভাগের পরপরই তিনি পলিটিক্স ছেড়ে প্রায় সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। তা না করে যদি শুধুমাত্র প্রচলিত রাজনীতির স্রোতে গা ভাসাতেন, তাহলে তিনি জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে

পারতেন। এসব কথা মনে রাখিস দাদুমনি। যে বাড়িতে তুই বউ হয়ে যাচ্ছিস, সেই বাড়ির কথা তোর জানা থাকা উচিত। ওর সববিছু তোর হবু বরও হয়তো জানে না।

শান্তা এতসব কথা শুনতে শুনতে আপ্লুত হতে থাকে। দাদা বুড়ো মানুষ, পঁচাত্তর ছাড়িয়েছেন, সবাই নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত বলে তিনি খানিকটা নিঃসঙ্গ, অবহেলিতই বলা চলে। কিন্তু শান্তা এই মুহূর্তে অনুভব করছে – এই লোকটি নিজেই এক জ্বলজ্যান্ত ইতিহাস। অবলীলায় বলে যাচ্ছেন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। হবু দাদাশ্বশুরের জন্য শান্তার এই মুহূর্তে গর্ববোধ হচ্ছে – যিনি শেরে বাংলার মতো বিশাল নেতাকে সামনাসামনি সমালোচনা করার দুঃসাহস রাখতেন। লোকটি সম্বন্ধে তার কৌতূহলও হচ্ছে।

তারপর কি হলো দাদু?

তোর শুনতে ভালো লাগছে দাদুমনি?

হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে।

গুড। অঞ্জনের কাছে হয়তো অনেক কথাই শুনবি, কিন্তু এসব বিষয় ও হয়তো এত ভালোভাবে জানেও না। ও তো ছোট থাকতেই মোফাজ্জল সাহেব মারা গেলেন, ওর বাবাকেও ও বেশিদিন পায়নি। আর তোকে যে এসব বলছি তার কারণও আছে। অঞ্জনের দাদাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি, ওর বাবাকেও। তাঁরা দু-জনেই খুব উঁচুমাপের দার্শনিক মানুষ ছিলেন। উদাসপুরের মতো একটা অজপাড়াগাঁয়ে বাস করেও, জাতীয় জীবনে বড়ো রকমের কোনো ভূমিকা না রেখেও, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁরা যে চিন্তাগুলো করে গেছেন, এক কথায় তা অসাধারণ। ঐসব চিন্তুভাবনা যদি কোনোরকমে জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হতো, তাহলে এই দেশের চেহারাই পাল্টে যেত। অন্তত আমার সেরকমই মনে হয়। অঞ্জনকে আমি খুব ছোটো দেখেছি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস – সে-ও তার বাপ-দাদার মতো ভাবুক ও দার্শনিক হবে। ওকে না দেখেই তোর বিয়ের ব্যাপারে মত দিয়েছি এ জন্যই। ওর বাবা সবসময় বলতেন, আমাদের এমন একজন নেতা দরকার, দেশকে নিয়ে যার একটি ভিশন থাকবে, দেশকে যে জানবে-বুঝবে-ভালোবাসবে। হয়তো ছেলেকে নিয়ে তাঁর এমন একটি স্বপ্নও ছিলো। জানি না অঞ্জন সেই স্বপ্ন ধারণ করে কী না। কিন্তু আমার মনে হয়, ওই পরিবারেই এমন একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে কোনো না কোনোদিন। হয়তো অঞ্জনের ঔরসেই, হয়তো তুই হবি সেই ছেলের মা। মা হয়ে তো তাকে এসব কথা তোর বলতে হবে!

কি যে সব বলো না দাদু!

না রে ভাই, লজ্জার কিছু নেই। আমিও তোর শ্বশুরের মতোই সারাজীবন এমন একজন মানুষের কথা ভেবেছি, যিনি এই জাতিকে প্রোপারলি নেতৃত্ব দিতে পারবেন। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এত সম্ভাবনাময় একটা জাতি কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। আমার ধারণা, অঞ্জনদের বংশ থেকেই জন্ম নিতে পারে এমন একজন মানুষ। ওদের বংশের ছেলেমেয়েরা সবসময়ই মেধাবি, দার্শনিক আর সংবেদনশীল হয়। এর সঙ্গে নেতৃত্বের গুণ যুক্ত হলেই এই দেশে একজন যোগ্য নেতা পেয়ে যাবে। বলা তো যায় না, আল্লাহ হয়তো তোর গর্ভে আর অঞ্জনের ঔরসেই সেই সন্তানের জন্ম দেবেন।

এসব কথা রাখোতো দাদু! শান্তার এসব কথা শুনতে ভালো লাগলেও বিয়ের আগেই সন্তান-টন্তানের প্রসঙ্গ তাকে লজ্জায় বিমূঢ় করে দেয়, আর দাদা সম্ভবত ব্যাপারটি বুঝতে পেরেই আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন।

মোফাজ্জল সাহেবের আরেকটা ঘটনা বলি, শোন। দেশভাগের পর তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন, ধর্মীয় বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু দেশভাগ সম্বন্ধে কোনো কথা প্রকাশ্যে বলতেন না। ব্যক্তিগতভাবে কেউ এ প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতেন – এটা এই জাতির জন্য একটা মারাত্মক ভুল। এই ভুলের পরিণাম শত শত বছর ধরে ভোগ করতে হবে। তিনি পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আর ভারত থেকে মুসলমানদের দলে দলে দেশত্যাগের ঘটনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। বলতেন, দেশ তো শুধু একখণ্ড মাটি নয়, এই যে এরা চলে যাচ্ছে, শুধু কি ঘর-বাড়ি-জমি-জমা ফেলে যাচ্ছে? একই সঙ্গে ফেলে যাচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি ও সম্পর্ক। ওখানে গিয়ে ওরা সহায়-সম্পত্তি যদি পায়ও, এগুলো পাবে কোথায়? তিনি ওই সময় হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভয় দিতেন, বলতেন, তোমরা যেও না, তোমাদের কোনো ভয় নাই। আমি থাকতে কারো সাধ্য নাই যে তোমাদেরকে কিছু বলে। এই কারণে ওই অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে তুলনামূলকভাবে কম। তো, এই মানুষটি – পাকিস্তানের জন্ম যিনি কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি, সেই তিনিই – মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ নিলেন।

শান্তা চমকে উঠলো, উনি রাজাকার ছিলেন?

না। দাদা শান্ত-সমাহিত। এই গালিটা তোদের জেনারেশনের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তা ভালোই। রাজাকারদের গালি দেয়াই উচিত। কিন্তু তোদের এটাও বুঝতে হবে – ওই সময় যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলো, তারা সবাই রাজাকার ছিলো না। রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস তো কতগুলো বিশেষ বাহিনীর নাম যেগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে বাঙালিদের সর্বনাশ করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিলো। এরা সব সুবিধাভোগী, গণবিরোধী লোকজন। পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের মধ্যেও অনেক রকম বিভাজন ছিলো। একটা অংশ স্রেফ রাজনৈতিক সুবিধাভোগী – ওই জামাতে ইসলামীর মতো দল; আবার আরেকটা অংশ ছিলেন – যারা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকার ফলে সেই পাকিস্তানের মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেননি। এই অংশটাকে আমি খুব একটা দোষ দেই না।

কিন্তু সারাটি দেশের মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে, তখন এর বিরুদ্ধাচরণ করাটাই কি একধরনের অপরাধ নয়?

ভালো একটা কথা বলেছিস দাদু। হ্যাঁ, তাদের দোষ এটুকুই যে, তারা জাতির আবেগ ইমোশনের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু এদের অনেকেই কোনোরকম সুবিধাও তো নেননি! আর মোফাজ্জল সাহেব এর কোনো ক্যাটাগরিতেই পড়েন না। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কি জিনিষ, তা তাঁর জানাই ছিলো না। নইলে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তো তিনি আর পাকিস্তানের বিপক্ষে থাকতেন না। দুটো সময়েই তাঁর অবস্থানটি ছিলো পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে এবং জাতির আবেগ-ইমোশনের বিপক্ষে। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশ ভেঙে গেলে জনগণের শক্তি ও সাহস কমে যায়। ফলে তিনি যে কারণে ৪৭-এ দেশভাগের বিপক্ষে

ছিলেন, একই কারণে মুক্তিযুদ্ধেরও বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর এই দর্শনের পক্ষে-বিপক্ষে আমি কিছু বলবো না, সেটা তোরাই ঠিক করে নিস। তবে তিনি যে তার দর্শনের ব্যাপারে এতটা রিজিড ছিলেন – এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতে পারি না। টুটুন ভাই, মানে তোর শ্বশুরও তাঁর এই রিজিডিটি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, দর্শন কোনো অনড় ব্যাপার নয়, যে, তার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। বরং জনগণের কোনো মহৎ আকাঙ্ক্ষার জন্য নিজের দর্শন ত্যাগও করা যেতে পারে। টুটুন ভাই তার বাবার এই অবস্থান সমর্থন করতেন না বলে তাদের মধ্যে একটা দুরত্বও সৃষ্টি হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একটা ঘটনা বলি, তুই বুঝতে পারবি, মোফাজ্জল সাহেব নীতির প্রশ্নে কতটা একরোখা ছিলেন। আমি নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাটা বলতে গেলে একটু পেছন থেকে বলতে হবে।

২৫ মার্চ রাতেই খবর পাওয়া গেলো, ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়েছে। খবর পেয়ে সেই রাতেই ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী মানিকগঞ্জ সদর থানা আক্রমণ করলেন। সফলভাবে আক্রমণ চালিয়ে রটিয়ে দিলেন যে তিনি সাতশ রাইফেল সংগ্রহ করেছেন। ওটা ছিলো তাঁর একটি কৌশল, যেন যুদ্ধের জন্য তরুণদের সংগঠিত করতে পারেন, যেন তাদের মনোবল চাঙ্গা থাকে। প্রকৃতপক্ষে তিনি মোটে সাতটা রাইফেল সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তো, তাই দিয়েই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে লাগলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে তুললেন – অস্ত্র-শস্ত্রও জোগাড় করে ফেললেন। ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী মানিকগঞ্জের অবিসংবাদিত নেতা, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান বিশাল। তো, তিনি একবার অঞ্জনদের বাড়িতে গেলেন হরিরামপুর থানায় মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি তৈরী করতে, এবং মোফাজ্জল সাহেবকে অনুরোধ করলেন – তিনি যেন তাঁর বাড়িটি এ কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দেন। মোফাজ্জল সাহেব সানন্দে অনুমতি দিলেন। তাঁর চরিত্রটা বোঝার চেষ্টা কর দাদুমনি। তিনি চাইতেন না যে, পাকিস্তান ভেঙে যাক, অথচ তাঁর বাড়িই হলো মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। এমন কি অস্ত্র-শস্ত্র পর্যন্ত ও বাড়িতেই জমা করে রাখা হলো। ক্যাপ্টেন হালিম জেনেশুনেই কাজটি করেছিলেন। তো, সেই গ্রামেও একদিন পাকিস্তান আর্মি এলো। অঞ্জনদের বাড়ির একটু দুরেই ছিলো ডাক্তার বাড়ি। এই ডাক্তার আলিম ছিলেন ব্রিটিশ আর্মির ডাক্তার। অবসর নেয়ার পর গ্রামেই বসবাস করতেন। তিনিও তাঁর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন – সেই অপরাধে পাকিস্তানিরা তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। শুনেছি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই স্মৃতি রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর পুরো বাড়িটাই সেই পুড়ে যাওয়া টিন দিয়েই ফের তৈরী করেছিলেন তিনি। তো, যথারীতি আর্মিরা অঞ্জনদের বাড়িতেও এলো – ইতিমধ্যেই তারা রাজাকারদের কাছে এই বাড়ির কথা শুনেছে। মোফাজ্জল সাহেব যে সাচ্চা মুসলমান এবং সাচ্চা পাকিস্তানি সেই খবরও জেনেছে এবং একইসঙ্গে জেনেছে যে, এই বাড়িটিই এই অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধোদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাপারটা তারা নিশ্চয়ই মেলাতে পারেনি, সেটা বোঝা গেলো তাদের কথাবার্তাতেই। ওই দিন আমি ওই বাড়িতেই ছিলাম। পালাতে পালাতে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই আশ্রয় নিয়েছিলাম।

ওরা এসে মোফাজ্জল সাহেবের সঙ্গে কথা বললো। একজন মেজর এসেছিলো, বললো, আপনি থাকতে এই এলাকায় মুক্তির এত উৎপাত কেন?

মোফাজ্জল সাহেব বললেন, উৎপাত বলছো কেন? ওরা তো ওদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে।

তার মানে? আপনি মুক্তিদের সাপোর্ট করেন? আপনি কি তাহলে চান পাকিস্তান ভেঙে যাক?

না, তা চাই না। কিন্তু তোমরা যা শুরু করেছো, তাতে পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আমরা তো কেবল পাকিস্তানকে রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করছি।

না তা করছো না। তোমরা জুলুম করছো। আল্লাহ্তায়ালা জালিমদের পছন্দ করেন না। তোমরা নিরীহ মানুষগুলোকে নির্বিচারে হত্যা করছো, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছো, মেয়েদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করছো, আবার এগুলো করছো ইসলামের নাম দিয়ে। আল্লাহপাক কোনোভাবেই ইসলামের এই অবমাননা সহ্য করবেন না।

কিন্তু স্যর, যুদ্ধের সময় এরকম দুয়েকটা ঘটনা তো ঘটেই।

তা ঘটতে পারে, কিন্তু যে যুদ্ধ ইসলাম রক্ষার নামে হচ্ছে সেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। ইসলামের ইতিহাসে এটা নেই। তোমরা অশিক্ষিত, মুর্খ, তাই জানো না, বোঝো না। যুদ্ধ করবে তোমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের সঙ্গে, নিরীহ মানুষের ওপর জুলুম করছো কেন? জুলুম করা দুরে থাক, তাদেরকে নির্ভরতা ও আশ্রয় দেয়াই ইসলামের নীতি। আমাদের নবীজি সেভাবেই যুদ্ধনীতি ঠিক করতেন। তোমরা সেদিন ডাক্তার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছো। তার অপরাধ – সে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয় – এই তো! ঠিক আছে বুঝলাম, কিন্তু পোড়ানোর আগে ওই বাড়িতে কোনো মানুষ না পেয়ে গরুগুলোকে গোয়াল ঘরে বেঁধে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছো। বন্দি বোবা জীবগুলো আর্তনাদ করতে করতে মারা গেছে। বলো, ওই নিরীহ জীবগুলো কি দোষ করেছিলো, বলো কোরআন হাদিসের কোথায় এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বলো ইসলামের ইতিহাসে কবে কোথায় এরকম জঘন্য ঘটনা ঘটেছে?

এতসব প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা ওই মেজরের পক্ষে সম্ভব ছিলো না সে তো বুঝতেই পারছিস। অনেকক্ষণ চুপ থেকে সে বললো,

আপনি কি মনে করেন, যুদ্ধ করে আমরা ভুল করছি?

যদি সত্যি তোমরা পাকিস্তান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে তাহলে সেটা ঠিক ছিলো, কিন্তু আমার তো মনে হয় যে, তোমরা ধরেই নিয়েছো – এই যুদ্ধে জেতা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, পাকিস্তান ভেঙে যাবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এটা ধরে নিয়েই তোমরা পরিকল্পিতভাবে এদেশের সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছো, যতটা সম্ভব এদেশের মানুষের সর্বনাশ করে যাচ্ছো। নইলে নিজের দেশে মনে করলে কি কেউ সেখানে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে! সত্যি করে বলো তো, তোমরা কি ওপর মহল থেকে এরকমই ইঙ্গিত পেয়েছো?

এসব কথাবার্তা শুনে ওই মেজর নিশ্চিতভাবেই রেগে যাচ্ছিলো। তার লাল হয়ে যাওয়া মুখ দেখে যে কেউ ভয় পেয়ে যেতো; আর তখন তো পাকিস্তানিদের মুখোমুখি হলেই যে কেউ ভয়ে মুতে দিতো; কিন্তু মোফাজ্জল

সাহেবের প্রবল ব্যক্তিত্ব, ধমকের সুরে কথা বলা দেখে মেজর কোনো কথাই বলছিলো না। চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে সে হয়তো তার অবস্থানটি মনে করিয়ে দেয়ার জন্যই বললো,

আমরা জয়ের জন্যই এসেছি চৌধুরী সাহেব। অন্তত ইন্ডিয়া বা তার দালালদের কাছে হার মানার চেয়ে মৃত্যুকেও ভালো মনে করি আমরা। কিন্তু আপনাদের মতো ইসলামপ্রিয় মানুষও যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যান, মুক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে কিভাবে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব?

আমি পাকিস্তানের বিপক্ষে চলে গেছি তা তোমাকে কে বললো? আমি তো সবসময়ই বলি রাষ্ট্র ভেঙে গেলে জনগণের শক্তি ও সাহস কমে যায়...

যদি তাই হয় তাহলে মুক্তিদের সাহায্য করেন কেন?

মুক্তিদের সাহায্য করি সেটাই বা তোমাকে কে বললো? আমি শুধু বলছি ওরা ওদের অবস্থান থেকে ঠিক কাজটিই করছে। তোমরা শুধু মেরেই যাবে, জুলুম-অত্যাচার করবে, আর এখানকার যুবকরা সেগুলো শুধু বসে বসে দেখবে, মুখ বুজে সব সহ্য করবে, তাতো হয় না। যুবকদের চরিত্রের সঙ্গে সেটা মানায়ও না।

তা বুঝলাম চৌধুরী সাহেব, আপনি আপনার নৈতিক অবস্থান থেকে কথাটা বলছেন; কিন্তু তাই বলে আপনি তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এটা তো ঠিক নয় । আমরা শুনেছি আপনার বাড়িতেই তারা অস্ত্র-শস্ত্র মজুদ করে রেখেছে।

কে বলেছে তোমাকে – মোফাজ্জল সাহেব গর্জে উঠলেন। বলো কে বলেছে?

যেই বলুক, কথাটা তো সত্যি?

তুমি কি তল্লাশি চালাতে চাও?

হ্যাঁ, চাই।

ওই সময় আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। এবার বোধহয় আর রক্ষা নাই। কিন্তু মোফাজ্জল সাহেব নির্বিকার। বললেন,

ঠিক আছে, চালাও তল্লাশি। কিন্তু মনে রেখ, যদি কিছু না পাও তাহলে আমাকে এই মিথ্যে হয়রানির জন্য আশপাশের দশগ্রামের মানুষ জড়ো হয়ে যাবে। তোমার কাছে যত অস্ত্রই থাক, এতগুলো মানুষের হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে না।

আর যদি কিছু পাই– মেজরের কণ্ঠে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ – তাহলে আপনাকে তো বটেই, দশগ্রামের একজন লোকবেও আমি জীবিত রাখবো না। প্রত্যেকটি বাড়ি আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো।

তোমরা তো শুধু ওটুকুই পারো। কিন্তু তুমি জানো না মেজর, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো। আমি মোফাজ্জল আহমদ চৌধুরী। আমার একটি ইঙ্গিতই তোমার মতো দশজন মেজরকে পানিতে চুবিয়ে মারার জন্য যথে । যাও – তোমার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম – তল্লাশি করো।

তাঁর কথাবার্তায় আমরা হতবাক। এই রিস্ক উনি নিচ্ছেন কিভাবে? ব্যাপারটিকে নিছক পাগলামি বলেই মনে হলো আমাদের। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মেজর তার মত বদলেছে। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেলো,

আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার সঙ্গে যদি আর দেখা না-ও হয়, পাকিস্তান যদি সত্যি সত্যি ভেঙেও যায়, আপনাকে আমার মনে থাকবে হুজুর।

এরকমই ছিলেন মোফাজ্জল সাহেব। কোনো ভাবেই মাথা নোয়াতেন না। নিজের নীতির প্রশ্নে ছিলেন অনমনীয়, ছিলো দুর্দান্ত সাহস। আর থাকবেই বা না কেন? শরীরে ছিলো এমন রক্ত যা ব্রিটিশদের অধীনে থেকেও ওদের দেয়া উপাধি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারতো। আর নিজেও তো ব্রিটিশ আমলে বাঘা বাঘা সব রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পলিটিক্স করেছেন। আমি পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

যদি সত্যি সত্যি তল্লাশি করতো চাচাজান? আপনি এরকম একটা রিস্ক নিলেন কিভাবে?

তল্লাশি করলেও কিছু পেত না।

পেত না? কেন? এ বাড়িতে অস্ত্র নেই?

আছে। কিন্তু সবার ধারণা, আমরা বাড়ির সিন্দুকে ওগুলো জমা করে রেখেছি। আরে হালিম (মানে ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী) কি এতই বোকা যে ওরকম প্রকাশ্য জায়গায় অস্ত্র রাখবে? ও এত বড় যোদ্ধা, পাকিস্তানিরা ওর মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, আর ওর মাথায় এতটুকু বুদ্ধি নেই!

ও আচ্ছা, তাহলে সবাই ভুল জানে। অস্ত্র অন্তত সিন্দুকে নেই। তাহলে কোথায় আছে চাচাজান?

সেটা তো তোমাকে বলা যাবে না। অন্তত মাটির ওপরে নেই এটুকু বলতে পারি। আমি, হালিম, আর টুটুল ছাড়া কেউ জানেও না কোথায় আছে। ওই মেজর সেটা বুঝতে পেরেছে যে, তল্লাশি চালিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না, নইলে কি আর এত সহজে ফিরে যায়!

পুরো ঘটনাটা আমাকে হতবাক করে দিয়েছিলো। সত্যি বলতে কি, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন নিয়ে আমার মনেও প্রশ্ন ছিলো – এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হলে হয়তো প্রশ্নটা রয়েই যেত। ওই ঘটনাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর নৈতিক সমর্থন থাকলেও, তিনি যেহেতু দার্শনিকভাবে যে কোনো দেশভাগের বিপক্ষে ছিলেন, তাই ব্যাপারটিকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর দর্শনে তিনি অনড় ছিলেন বলেই অতবড় একজন মানুষ হয়েও পাকিস্তান নামক দেশটি থেকে মানসিকভাবে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিভৃতচারি হয়ে উঠেছিলেন। ওই একই কারণে তিনি বাংলাদেশের পক্ষ নেননি। এসব তোর ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে দাদুভাই, ভবিষ্যত বংশধরদের বোঝাতে হবে।

দাদু থামলেন। অনেকক্ষণ কথা বলে তিনি খানিকটা হাঁপিয়ে উঠেছেন। শান্তার ইচ্ছে হলো অঞ্জনের বাবার ভূমিকা জানতে। কিন্তু দাদুর ক্লান্তি দেখে থেমে গেলো। না হয় আরেকদিন জিজ্ঞেস করা যাবে ভেবে উঠে এলো তখনকার মতো।

পরে – মানে, বিয়ের পরে – শান্তা অঞ্জনকেই জিজ্ঞেস করেছিলো এ সম্বন্ধে। অঞ্জন বলেছিলো – দাদার সঙ্গে তো আর এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগ আমার হয়নি, তবে বাবার কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, দাদার সীমাবদ্ধতা ছিলো ওই একটি জায়গাতেই। সেটা হচ্ছে নিজ দর্শনের প্রতি তাঁর অনড় অবস্থান। যেটাকে তিনি দর্শন হিসেবে গ্রহণ করতেন তার ভালো-মন্দ-দোষ-গুণ বিচারের কথা তিনি ভাবতেন না। পৃথিবীর কোনো দর্শনই যে সব কালে সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, এই কনসেপ্টটা দাদার ছিলো না। তাঁর এই মনোভাবের পেছনে সম্ভবত তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইসলামের মূল কনসেপ্টই হচ্ছে প্রশ্নহীন আনুগত্য ও বিশ্বাস। ইসলাম মৌলিক কতগুলো ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন অ্যালাও করে না। দাদাও তা করতেন না।

আর বাবা? – শান্তা জিজ্ঞেস করেছিলো।

আমার বিবেচনায় বাবার দার্শনিক প্রতীতি ও চেতনাগত মান দাদার চেয়ে উন্নততর ছিলো। তিনিও ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনও করতেন, কিন্তু জাগতিক বিষয়গুলোকে তিনি ধর্ম থেকে পৃথক করে দেখতেন; কিংবা বলা যায় ধর্মের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনের একটা সংঘাতহীন বিরল সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি।

কীভাবে সেটা ঘটেছিলো পরবর্তীকালে নানা উদাহরণ দিয়ে শান্তাকে তা বুঝিয়ে দিয়েছে অঞ্জন।

৩

দাদুর হম্বি-তম্বি আর বিয়ের আগেই তাবৎ আত্মীয়-স্বজনের কাছে গর্ব করে বলে বেড়ানোর ফলে শান্তার বাবার আর পেছানোর কোনো উপায় রইলো না। অবশ্য তিনি জানতেন – অঞ্জন আমেরিকা থেকে পড়াশোনা শেষ করে এসেছে, কিন্তু ওখানেই আবার ফিরে যাবে কী না, না গেলে এখানে কী করবে – ব্যবসা না চাকরি – সে বিষয়ে বেন্ডই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না। যে আত্মীয়টি বিয়ের ঘটকালি করছিলেন, তিনি তো ননই, এমনকি অঞ্জনের বোনরাও এ বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ। একটা আমতা আমতা ভাব সবার মধ্যে। এ নিয়ে শান্তার বাবার মধ্যে একটু সংশয় ছিলো, কিন্তু পাত্রের একাডেমিক ক্যারিয়ার ভালো, বংশপরিচয় উজ্জ্বল, স্বভাব-চরিত্র ভালো হলে... – এত যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলেরা তো এদেশে বসে থাকে না, সহজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, না হয় দাঁড় করিয়ে দেয়া যায় – এইসব বিবেচনায় বিয়েটা হয়ে গেলো। এখন যে বেন্ড তাদেরকে দেখলে খুশি হবে। সুন্দর সংসার হয়েছে শান্তার । অঞ্জন বড়সড় একটা চাকরি করে, গোছানো ছিমছাম একটা ফ্ল্যাটে তাদের দু জনের ছোট্ট সংসার। কিন্তু এসব বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, সে একজন চমৎকার মানুষকে পেয়েছে জীবনসঙ্গী হিসেবে। অন্তত শান্তার স্বপ্নে যেমন ছিলো – তার প্রায় পুরোটাই পূরণ করেছে অঞ্জন। ও দেখতে-শুনতে যেমন সুন্দর, তেমনি কথাবার্তায়ও; গভীর অনুভূতিপ্রবণ, উদার, কনসিডারেট, আবার বেশ খানিকটা উদাসীন ও রহস্যময়। তাছাড়া যে লোকটি শুধু কথা বলে তার চোখে এঁকে দিয়েছে একটি গ্রামের সচল চিত্র,

কয়েকটি কিশোর-কিশোরীর দুরন্ত বেড়ে ওঠার দৃশ্য, তার প্রতি এক অন্ধ মুগ্ধতা জন্ম নেয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শান্তা তো নিজেই এখন ওই গ্রামের একটা বর্ণনা দিয়ে দিতে পারবে। তো, তাকে বর্ণনাটি দিতে বললে সে কি বলবে? অঞ্জনের মত অত সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারবে না, তবে তার চোখে প্রথমেই ভেসে উঠবে ওদের বিশাল বাড়িটি।

কত বিশাল সে সম্বন্ধে অবশ্য ধারণা করা মুশকিল। বিঘা কাঠার হিসাব আমি কোনোদিন বুঝিনি। তবে অঞ্জন বলেছিলো – তুমি যদি বাড়িটাকে কেন্দ্র করে একটা রাউন্ড দিতে চাও, তাহলে অন্তত পনেরো মিনিট সময় লাগবে। এতেই আমার হয়ে গেছে। এত বড়! শুধু ঘুরে আসতেই পনেরো মিনিট! তো, সেই বাড়ির উত্তরে একটা পুকুর, পুবে একটা। উত্তরেরটা মজা পুকুর, অকেজো – অত এব ভূমিকাবিহীন। পুবের পুকুরই বাড়ির প্রাণ। বঁচুরিপানা, কৈ মাছ, বড়শি দিয়ে মাছ ধরা, কি সময়ে অসময়ে অঞ্জনদের ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য বুকে নিয়ে ওই পুকুর অমর হয়ে আছে। বাড়িটা বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ চারপাশে লাগোয়া কোনো বাড়ি নেই, আছে ফসলি জমি। উত্তর দিকে একটু দুরে একটা বাড়ি, লোকে সেটাকে ডাক্তারের বাড়ি বলে জানে; যে ডাক্তারের গল্প দাদার কাছেও শুনেছি – ব্রিটিশ আর্মির পালানো ডাক্তার আলিম চৌধুরী; মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাড়িটি পাকিস্তান আর্মিরা পুড়িয়ে দিয়েছিলো – আলিম সাহেব নাকি সেই স্মৃতি আমৃত্যু অবিকল রেখে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ দিকে, একটু দুরে, অঞ্জনদের দুর সম্পর্কের এক চাচার বাড়ি। এ দুটো বাড়িও বড় বড় এবং বিচ্ছিন্ন। উত্তর দক্ষিণে আরো কিছু বাড়িঘর আছে বটে কিন্তু লাগোয়া নয় কোনোটাই। এরকম বিচ্ছিন্ন বাড়িঘরওয়ালা গ্রামের কথা আমি কোনোদিন শুনিনি। স্কুলের বইতে পড়া গ্রামের সংজ্ঞা আমার মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে – কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি পাড়া, কয়েকটি পাড়া মিলিয়ে একটি গ্রাম – এই রকম; অর্থাৎ বাড়িগুলো পাশাপাশি থাকার কথা। এই সংজ্ঞার সঙ্গে উদাসপুরের কোনো মিলই নেই। তো, এই গ্রামটিতে বর্ষায় যখন নদী-খাল উপচে পানি এসে পড়ে, তখন এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে হয় নৌকা করে। দৃশ্যটির কথা ভাবতে আমার ভারি ভালো লাগে। পাশাপাশি দু টো বাড়ির মাঝখানে পানি, যেতে হচ্ছে নৌকায় করে। ইস! কী রোমান্টিক! অঞ্জনদের বাড়ির পুবদিকে দীর্ঘ মাঠ – ফসলি জমি – পেরিয়ে প্রধান সড়কের ওই পাশে পাশাপাশি বাড়ি আছে অনেকগুলো । বাড়ির পশ্চিমদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মাঠ পেরিয়ে ক্ষীণকায় ইছামতি শান্ত বয়ে চলেছে। সন্ধ্যা হলে এই ছবির মতো গ্রামটির আকাশে বাতাসে এক ভীষণ উদাসীনতা নেমে আসে। অঞ্জন বলেছে, ছোটোবেলায় বোঝেনি, এখন মনে হয় – সন্ধ্যা নেমে এলে অকারণে মন খারাপ হয়ে যেত কেন! আসলে ওই তীব্র উদাসীনতাই জন্ম দিতো এক গভীর বিষণ্নতার – শুধু অঞ্জনের মধ্যেই নয়, সবার মধ্যেই। মানুষগুলো তখন কী রকম চুপচাপ হয়ে যেত। তাদের চোখে মুখে যেন একসঙ্গে গাঁথা হয়ে যেত হাজার বছরের বিস্মৃত কথকতা। সেই আগের দেখা দৃশ্যের সঙ্গে নিজের বর্তমান বোধ-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা মিলিয়ে দেখলে অঞ্জনের মনে হয় – মানুষগুলো যেন একালের নয়, যেন তারা বহন করে নিয়ে এসেছে হাজার বছরের

পুরোনো ইতিহাস-ঐতিহ্য-স্মৃতি ও জীবন যাপনের অন্যান্য অনুষঙ্গ। সন্ধ্যা নামতো আর বাড়ির মসজিদে আব্বা আজান দিলে বাড়িতে বাড়িতে বাতি জ্বলে উঠতো। অর্থাৎ সন্ধ্যা হলো, এবার বাড়ি ফেরা যাক। আব্বার আজান ছিলো ওই গ্রামের মানুষদের জন্য সংকেতের মতো। সন্ধ্যার আজান মানে ঘরে ফেরা, বাড়ি বাড়ি সন্ধ্যা বাতি জ্বালানো; এমন কি হিন্দুপাড়ার তুলসিতলায় বা ঠাকুরঘরে ধুপধোঁয়া জ্বলতো আব্বার আজান শুনেই। আবার এশা র আজান মানেই – রাত হলো, এবার ঘুমোনোর আয়োজন হোক। সন্ধ্যার পর বড়োজোর ঘন্টাতিনেক, তারপরই গ্রামটা একেবারে নিঝুম। ঘুমে নিঃসাড়। শুধু অঞ্জনদের বাড়িতে আব্বা বই পড়ছেন, মা টুকটাক কাজ সেরে খাওয়ার আয়োজন করছেন। আর তারা কয়েক ভাইবোন স্কুলের পড়া সেরে গল্পে বা খেলায় মেতেছে। খাওয়ার পর মা র কাছে শুয়ে অঞ্জন কেচ্ছা শোনার বায়না ধরলে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়তো – জীবনটাই তো এক কেচ্ছারে বাবা, কত গল্প জমে আছে বুকের ভেতর ... মো'র কথা অঞ্জন খুব একটা বলে না, বলতে গেলে হঠাৎ বিসদৃশভাবে থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। তবু এই কথাটি ও বলে ফেলেছিলো – মা'র কাছ থেকে রূপকথা শোনার সাধ আমার কোনোদিন পূরণ হয়নি। তখন বুঝিনি – এখন বুঝি, কথাটা কত বড়ো জীবন সত্য। জীবন তো একটা কেচ্ছাই। একটা রূপকথা। শুধু ওই শেষাংশটি – *তাহারা সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিলো* – মানুষের জীবনে সত্য হয় না কখনো। মা র কথাই ধরা যাক। কত বড়ো ঘরের মেয়ে, বড়ো ঘরের বউ, তাঁর স্ট্যাটাসের সবাই যখন শান-শওকতে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছে, তখন তিনি স্বামীর জীবন-দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এক অজপাড়াগাঁয়ে হাড়ি ঠেলে যাচ্ছেন। যেন রাজকন্যা গেছে নির্বাসনে। তাঁর বুকের ভেতর না জানি কত কথা জমে ছিলো, কোনোদিন যা বলতে পারেননি। ... কেচ্ছা না শুনেই অঞ্জনকে প্রতিদিন ঘুমিয়ে পড়তে হতো আর মধ্যরাতে স্বপ্ন দেখে বা প্রকৃতির ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে প্রথমেই পাশে হাত দিয়ে দেখতো, মা নেই। কোথায় গেলো এই এত রাতে! না, ওই তো মা র খড়মের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে জানে, বাইরে হয়তো গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আর মা উঠোনে শুকোতে দেওয়া লাকড়ি তুলতে বাইরে গেছে। খট খট খট খট। খড়মের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মা আসছে। খট খট খট খট। কী রিদমিক মায়ের ফিরে আসার ওই শব্দ। ওই শব্দ শুনতে শুনতেই সে কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছে ফের! এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে অঞ্জন ওই শব্দ শুনতে পায় । খট খট খট খট। মায়ের ফিরে আসার শব্দ। পৃথিবীতে এর চেয়ে মধুর শব্দ সে আর কোনোদিন শোনেনি।... এইসব বলতে বলতে অঞ্জনের চোখ ভিজে উঠেছিলো।)... উদাসপুরের নামটি যিনি রেখেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন, কবিও হতে পারেন, নইলে একটি গ্রামের নাম উদাসপুর হয়! .... বাড়ির দক্ষিণ দিকে ৫/৬ মাইল দুরে পদ্মা। ভীষণ রাগী নদী। বর্ষার আগে আগে তার রাগ বেড়ে যেতো। প্রতিবছর এই সময় সে তার সীমানায় থাকা ভিটেবাড়িঘর আর ফসলী জমি ভেঙে নিজের বিস্তার ঘটায়। জোয়ার আসে। স্বচ্ছ পানি ঘোলা হয়। স্রোত ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, আর অঞ্জন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে সেই উন্মত্ত স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ্বাসই হতে চায় না। এত দুঃসাহসী এই লোকটা! যদি ভাসিয়ে নিয়ে যেত! পানি বাড়ে। দু-কুল ছাপিয়ে মাঠঘাট ভেসে যায়। গ্রামের তখন অন্য রূপ। পানি কমার সময় পদ্মা আবার রেগে ওঠে। আবার কিছু অংশ ভেঙে যায়। এইভাবে

প্রতিবছর পদ্মা তার সীমানা বাড়াচ্ছে। ব্যোপারটা আমি ঠিক বুঝি না। খামোখা পদ্মা বাড়ি-ঘর-মাঠ-ঘাট ভেঙে নেবে কেন? যাদের ঘর-বাড়ি ভেঙে নেয় তারা যায় কোথায়? আমি কখনো তেমন করে গ্রাম দেখিনি। দু এবারবার দাদার বাড়ি গিয়েছি, সেটাও মানিকগঞ্জ শহরে। সেখানে নদী একটা আছে বটে – কালিগঙ্গা – কই সেটা তো ভাঙেনা!) ... উদাসপুরের জীবনযাত্রা প্রতি ঋতুতে বদলে যায়। বর্ষায় কাজ নেই কারো। নিঝুম বৃষ্টিতে বাচ্চারা হয়তো ভেজাভিজি অথবা কাদা ছোঁড়াছুড়িতে মাতে, কিংবা নতুন আসা পানিতে মাঠে গাড়া বড়শি দিয়ে মাছ ধরে। রান্নাঘরে ছোলা ভাজা হয় ঝিমিয়ে পড়া পুরুষরা খাবে বলে। কোনো এক ঘরে হয়তো এসে জড়ো হয় আরো কয়েক ঘরের মানুষ, শুরু হয় কেচ্ছাকাহিনী বা সুর করে পুঁথি পড়া। সমর্থ পুরুষরা বেরিয়ে পড়ে মাছ ধরার নানা সরঞ্জাম নিয়ে – বড়শি, ঝাঁকি জাল, হোচা, দুয়ারি – এতসব জিনিষের নাম মনে রাখাও মুশকিল। আসলে পুরো বিষয়টি আমার পক্ষে বোঝাটাও একটু কষ্টকর। দু-তিনটে মাস মানুষ কোনো কাজকর্ম করে না – শুধু শখ করে মাছ ধরা, পুঁথি পড়া, আর ছোলাভাজা খাওয়া ছাড়া – এ কেমন কথা! গ্রামের মানুষদের তো এত সঞ্চয় থাকার কথা নয় যে, কয়েকটা মাস কোনো কাজ না করে, আয়-উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা না করে, স্রেফ গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিতে পারবে! অথচ অঞ্জনের বর্ণনা শুনে সেরকমই মনে হয়। ... আষাঢ়-শ্রাবণ এই দু মাস মিলে বর্ষাকাল – বইতে পড়া এই সংজ্ঞাও নাকি অসম্পূর্ণ। বর্ষা শুরু হয় মধ্য আষাঢ়ে এবং শেষ হয় ভাদ্রের শেষে। অর্থাৎ আমার জানা শরৎকালের অর্ধেকই থাকে বর্ষার পেটে। তবে আশ্বিনে নাকি সত্যি শরৎকাল তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয় – অর্থাৎ আকাশে তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা আর নদীর তীরে ফুলে ফুলে ছাওয়া কাশবন। হেমন্তে উৎসবের মতো করে শুরু হয় ধানকাটার আয়োজন। কিন্তু এ দু টো ঋতু বর্ষা বা শীতের মতো এমন বৈচিত্র্যপ্রবণ নয়। শীতের সময় উদাসপুরকে ঢেকে ফেলে স্বর্গ থেকে নেমে আসা স্বপ্নের মতো কুয়াশা। আর জোসনা রাতে মানুষগুলো যেন জোসনার তৈরী পুতুল হয়ে যায়। তাদের গা থেকে জোসনা গড়িয়ে পড়ে, ভিজিয়ে দেয় রুক্ষ মাটি। সকালে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে উদাসপুর ঘুমায়। মাটির চুলায় খেজুরের রস জ্বাল হয়। অঞ্জনরা পুবমুখী উঠোনে রোদ পোহাতে জড়ো হলে মগে করে লালচে গরম রস আর মুড়ি আসে মা র কাছ থেকে। কখনো বা বাড়ির রাখাল ছেলেটার সঙ্গে পরামর্শ করে অঞ্জন দুষ্টুবুদ্ধিতে মাতে। রাতে খেজুর গাছ থেকে রস পেড়ে খেয়ে সাবাড় করে। সেই রসে গাছির ভাগ আছে। তার রাগারাগি করার কথা। করে না। পুনাপান তো খাইবোই – এরকম একটা স্নেহপ্রবণতা তার এক্সপ্রেশনে ফুটে ওঠে। ... উদাসপুর আসলে সম্প্রীতির গ্রাম। এখানে মানুষ বড়ো ভালোবাসে এক অপরকে। এমন একটি স্বপ্নের মতো গ্রামেও কিন্তু অভাব আছে, দারিদ্র আছে। পদ্মার ভাঙন এ অঞ্চলের একটি বড় সমস্যা। প্রতিবছরই কিছু মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কৃষিকাজ নির্ভর এইসব মানুষ জমি হারানোর মতো বিপর্যয়কর ঘটনার রেশ অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারে না। নিজের জমি-জমা-বাড়ি-ঘর হারিয়ে অন্য গ্রামে এসে মানুষগুলো ঘর বাঁধলে সমস্যা বাড়ে দুই তরফেরই। এক গ্রামে পড়ে তিন গ্রাম মানুষের চাপ, সীমিত কাজের সুযোগ আরো সীমিত হয়ে যায়, ফলে বসন্তের মাঝামাঝি থেকেই অভাবের পদধ্বনি শোনা যায়। চৈত্রের শেষে গিয়ে সেটা প্রকট আকার ধারণ করে। এরই ধারাবাহিকতা

চলে আষাঢ়ের শুরুতে আউশ ধান ওঠার আগ পর্যন্ত। কিন্তু যাদের অভাব নেই, তাদের চোখেই ধরা পড়ে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন। বসন্তে গ্রামের বৃক্ষচূড়া গাছগুলো যেন আগুন রঙা রঙে সাজে, যার তুলনা এই পৃথিবীর আর অন্য কিছুর সঙ্গে হবে কী না, অন্তত অঞ্জন এ বিষয়ে সন্দিহান। কিংবা গ্রীষ্মের বাতাসে নানা ধরনের মৌসুমি ফলের গন্ধ যেমন জানিয়ে দেয় আমি এসেছি – এমন করে শুধু গন্ধ দিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়া ঋতু পৃথিবীর আর কোথায় আছে? উদাসপুরের সবকিছুই এমন তুলনাবিহীন, ইউনিক – অঞ্জন এত জায়গায় গিয়েছে, কোনোকিছুই উদাসপুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি।

নাহ্, হলো না। এই বর্ণনায় শান্তা নিজেই সন্তুষ্ট নয়। কি যেন নেই এই বর্ণনায়। অঞ্জনের কাছে যা নিজের প্রাণের মতো প্রিয়, শান্তার কাছে তা কেবল গল্পই – সে কি করে পারবে অঞ্জনের মতো অমন একটা অসামান্য বর্ণনা দিতে?

৪

অঞ্জন আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছে প্রায় ১২ বছর। দীর্ঘ একটি সময়। কত কিছু ঘটে গেছে এই সময়ে, কত কিছু বদলে গেছে আমূল! মায়ের মৃত্যু তেমনই একটি বড় ঘটনা। আমেরিকায় তাকে পাঠানো হয়েছিলো তার মতের বিরুদ্ধে, প্রায় জোর করেই – এদেশে কিছু হবে না, ছাপরা হরতাল, বোমাবাজি, মিছিলমিটিং করলে পড়াশোনা আর করবে কখন? অতএব এ দেশে কোনো ভবিষ্যত নেই – এই অজুহাতে কলেজ পাশ করে বেরুনোর পরই পরই তাকে বাইরে পাঠানোর জন্য তোড়জোর শুরু হলো। বাবা নেই, মা-ও এসব বিষয়ে চিরদিনই মতামতহীন, বাবার মৃত্যুর পর তিনি আরো নির্জন হয়ে গেছেন – অঞ্জনের না যাওয়ার পক্ষে কথা বলার মতো কেউ ছিলো না। বোন-দুলাভাইরা তো পারলে একমুহূর্ত দেরি না করেই পাঠিয়ে দেয়। এমন কি – মাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না – এমন ইমোশনাল কথাবার্তাকেও তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। সে গিয়েছিলো খানিকটা ক্ষোভ নিয়েই। যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো না – তার কেন যেন মনে হতো, গেলে আর ফেরা হবে না কখনো; সে তা ভাবতেই পারতো না – একটি ভিন্ন দেশে গিয়ে সেটেল করার চিন্তা মানুষ কিভাবে করতে পারে, সে এখনও বোঝে না। তো, গিয়ে, যত তাড়াতাড়ি ফেরা যায় ততই মঙ্গল, ভেবে প্রথম প্রথম খুব পড়াশোনায় মন দিয়েছিলো। মাত্র এক বছরের মাথায় যে মা'র মৃত্যু ঘটবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার তখন সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছিলো, এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে জানানোও হয়নি যে, মা নেই। সে জেনেছে প্রায় বছরখানেক পর – যখন ফোন করে করে, মার সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে চেয়ে সবাইকে অতিষ্ট করে তুলেছিলো। কত দিনই বা এমন একটি ব্যাপার চেপে রাখা যায়? মা বাড়িতে গেছে, বা

খালার বাসায় গেছে, কি অসুস্থ ইত্যাদি বলে বলেই বা কতদিন আর সত্যটাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? জানার পর তার সবকিছুই এলোমেলো হয়ে পড়ে, তীব্র এক শূন্যতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। বোনদের প্রতি এক ভয়াবহ ক্ষোভ আর অভিমান জন্ম নেয়। সে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারটির জন্য বোনদেরকে ক্ষমা করতে পারেনি। মাকে একবার শেষবারের মতো দেখা হলো না – পড়াশোনা, ক্যারিয়ার ইত্যাদি কি এইসব ইমোশনের চেয়েও বড়? অভিমান করে সে নিজে থেকে দেশের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলো। দেশে ফেরার কথাও ভাবা বন্ধ করে দিয়েছিলো সে। সেটা এজন্য নয় যে, ওখানে তার ভালো লাগছিলো, বা ওই জীবনযাপন তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো বা কোনো মোহ সৃষ্টি হয়েছিলো। বরং ফেরার কথা ভাবলেই – কার কাছে ফিরবো আমি, কার কাছে? আমার তো আর কেউ রইলো না – এই ধরনের একটা শূন্যতাবোধ তাকে আক্রান্ত করে ফেলতো, তাকে প্রায় বিপর্যস্ত করে তুলতো। ওখানে সে ছিলো ভাসমান, অন্তত নিজেকে সে ওরকমই ভাবতো। আমেরিকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে কখনো খাপ খাওয়াতে পারেনি অঞ্জন। এতদিন বসবাস করেও সবসময় তার মনে হয়েছে – এ দেশে আমার নয়, এ দেশের কোনোকিছুই আমার নয়, এর ভালোমন্দে কিছুই যায় আসে না আমার। বহিরাগতদের স্বাভাবিক আচরণে সে সবসময় থেকেছে ওপর-ছোঁয়া, উদ্বাস্তুর মতো ঠিকানা বদল করেছে বারবার। উদাসপুরের জন্য মন কাঁদতো সবসময়। বাঙালি বন্ধু-বান্ধবদের কাছে উদাসপুরের গল্প করতে গিয়ে বকাবাজি খেতে হয়েছে কতবার তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ওরা যে কিভাবে পারে, কিভাবে যে ওই অচেনা দেশে নিজেদেরকে এভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, অঞ্জন তা ভেবে বের করতে পারেনি কোনোদিন। আমেরিকা মানেই যেন স্বর্গ, আর ওখানে যারা সেটেল করেছে বা করতে চাইছে তাদের কাছে দেশ মানে যেন এক বিভীষিকা, সেখানে দু-চারদিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু বসবাস করা যায় না কিছুতেই। যেন এই দেশটিতে কোনো মানুষ বসবাস করছে না, যেন এদেশের মানুষের জীবনে সুখ, আনন্দ, ভালোবাসা আর সম্ভাবনা নেই কোনো। অথচ সে দেখেছে, ওখানে গিয়ে অনেক বাঙালিই কী মানবেতর জীবন যাপন করে, কী ভয়াবহ পরিশ্রম করে কয়েকটা বেশি ডলার উপার্জনের জন্য। সংখ্যালঘুত্বের অনুভূতি বুকে নিয়ে, দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক জীবন যাপনেও কোনো আপত্তি নেই তাদের, দেশে এর চেয়ে অনেক সম্মানজনক জীবনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তারা তবু দেশে ফিরতে রাজি নয়। অঞ্জন এই মনোভাব অর্জন করতে পারেনি বলে মানসিক যন্ত্রনায় জর্জরিত হতে হয়েছে, আবার দেশে যে ফিরবে সেরকম কোনো প্রেরণাও নিজের কাছে পাচ্ছিলো না। বছর তিনেক আগে, আমেরিকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলো, ঘোরাঘুরি পর্যন্তই, কোথাও ভালো লাগেনি। আবার সেই আমেরিকাতেই ফিরে এসেছে সে। এ ছিলো এমনই একটি সময়, যখন সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুব জরুরী, কিন্তু কিছুতেই কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছিলো না সে। এবার আপুনি গিয়ে প্রায় জোর করে নিয়ে না এলে হয়তো ফেরাই হতো না। দেশে ফিরে জায়গা তৈরী করে নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি তার। বোঝে সে, এসবই পূর্বপরিকল্পিত। যদিও কেউ জানতো না অঞ্জন কি সিদ্ধান্ত নেবে, এমনকি সে নিজেও জানতো না, তবু সব কিছু যেন প্রস্তুত করাই ছিলো। নইলে ছ'মাসের মধ্যে চাকরি-বাকরি, বিয়ে করে রীতিমতো সংসারী হওয়া সম্ভব হতো না। সবকিছুই এখন

ঠিকঠাক, একটি হ্যাপি এন্ডিং ফিল্মের মতো প্রায়, তবু, সে টের পায়, কোথায় যেন বিশাল একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সেই ফাঁকে সে প্রায়ই একটি প্রমাণ সাইজের জ্বলজ্বলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখতে পায়। তার দৈনন্দিন জীবনযাপনকে নিয়ত তাড়া করে ফেরে ওই চিহ্ন।

অঞ্জন অন্য সব সংসারী মানুষের মতোই সকালে অফিসে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। তারপর থেকে বসে থাকে বাসায়ই। বাইরে প্রায় যেতেই চায় না, শান্তা খুব জোর করলে কখনো বোনদের বাসায়, কখনো শান্তাদের বাসায় গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসে। শান্তাদের বাসায় গেলে দাদার সঙ্গে বসে গল্প করে, আবার বোনদের কাছে গেলেও সেই পুরনো দিনের গল্প। যেন দুটো জায়গায়ই সে যায় কেবল ফেলে আসা জীবনের গল্প করতে বা শুনতে। শান্তা অবশ্য কোনো ব্যাপারেই তাকে খুব একটা জোর করে না। লোকটাকে সে বোঝার চেষ্টা করছে। কেন সে কোথাও যেতে চায় না, কেন এমন দীনহীনের মতো একা একা বসে থেকে গম্ভীর হয়ে কেবল কী যেন ভাবে! অঞ্জনকে সে দু-একবার এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে –

তুমি কোথাও ঘুরতে টুরতে যাও না কেন?

উত্তরে অঞ্জন বলেছে – কোথায় যাবো? কিছু চিনি না তো!

তাই বলে এমন ঘরে বসে থাকবে? বাইরে না গেলে চিনবে কি করে? আর তাছাড়া আমি তো আছিই, আমিই না হয় সবকিছু চিনিয়ে দেবে।

তুমি খুব বেশি হলে কয়েকটি মাত্র জায়গা চিনিয়ে দেবে। কিন্তু এই শহরে তো আমার পরিচিত কোনো মানুষও নেই, তার কি ব্যবস্থা করবে?

আস্তে আস্তে সেসবও হবে।

হবে না শান্তা, এই বয়সে নতুন করে আর কিছু হওয়ার নেই।

এই কথা শুনে শান্তা খুব হেসেছে – কি এমন বয়স হয়েছে তোমার যে বুড়ো মানুষের মতো বলছো, এই বয়সে আর কিছু হবে না। এখানে তোমার বয়সি ছেলেরা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে চাকরির জন্য চেষ্টা করে আর আড্ডাবাজি করে নরক গুলজার করে। জীবনে ঠিক মতো প্রবেশই করে না। আর তুমি বলছো – আর কিছু হবার নেই!

সমস্যাটা তো এখানেই – শান্তাকে যা কোনোদিন বোঝানো যাবে না। এই শহর আমি চিনি না, এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া পরিচিত কোনো মানুষও নেই। এখানে আমি থেকেছি খুব সামান্য সময় – মাত্র তিন বছর – অন্তত কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য এ সময় সামান্যই, তার আগে ষোলো বছর উদাসপুর, পরে প্রায় একযুগ আমেরিকায়। ঢাকার চেয়ে নিউইয়র্ককে আমি ভালো করে চিনি। এই শহরে আমার কোনো শেকড় নেই। যে বয়সে প্রকৃত পক্ষে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে – সেই বন্ধুত্ব এতই গভীর যে কখনো কখনো তা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে –

আমার সেই বয়স, সেই সোনালী যৌবন কেটেছে বিদেশ-বিভুঁইয়ে, ভিন্ন ভাষার ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের কাছে, যাদেরকে কখনো আপন বলে ভাবতে পারিনি আমি। নানা রকম অস্থিরতায় উদ্ভ্রান্ত সময় কাটিয়েছি, কোথাও শান্ত হয়ে দু-দণ্ড বসিনি, নির্মাণ করিনি কোনো নতুন সম্পর্ক, কোথাও গাড়িনি শেকড় যে, কোনো পিছুটান থাকবে – আমেরিকায় তাই আমার কিছুই পড়ে নেই। না থাক, তাতে আমার আফসোস নেই, কিন্তু এ শহরেও যে আমার কিছু নেই। না বন্ধু-বান্ধব, না পরিচিতজন, শুভাকাঙ্খী স্বজন বা সুজন, না কোনো স্মৃতি। আমি কোনোদিন কারো সঙ্গে বসিনি এই শহরের কোনো রেস্তোরায়, হেঁটে বেড়াইনি কোনো তরুনীর হাত ধরে কোনো পার্কে বা রাস্তায়, মেলায় বা উৎসবে। এখানকার কোনো কিছুই যেন আমার নয়, এখানেও আমি এক ভয়াবহ বহিরাগত, আমার সবকিছুই কেবল ওপর- ছোঁয়া। এতদিন পর এখানে ফিরেছি আমি, ফিরে দেখি – কিছুই আমার নয়। আর ফিরেছি এমন একটা বয়সে যখন নতুন করে আর কোনো সম্পর্ক নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এই কথা শুনে শান্তা খুব হেসেছে, বলেছে – এখানে এই বয়সে ছেলেরা জীবনেই প্রবেশ করে না, সেশনজটের ধাক্কায় পাশ করে বেরুতে বেরুতেই অনেক বয়স হয়ে যায়, তারপর রয়েছে চাকরির অনিশ্চয়তা, কিংবা চাকরি পেলেও থিতু হয়ে বসতে বসতে আরো দু-তিন বছর তো লেগেই যায়, ফলে আড্ডা দিয়ে নরক গুলজার করা ছাড়া তাদের তেমন কোনো কাজই থাকে না। ওটাই হচ্ছে বিষয় – তাদের আড্ডা দেয়ার সঙ্গী আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে – যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ৭/৮ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে, এবটু এবটু করে। গড়ে উঠেছে পরস্পরের মনের মিলের জন্য, বোঝাপড়ার মাধ্যমে, উত্থান-পতনের মাধ্যমে, অনেকটাই স্বার্থহীন ভাবে, কিংবা স্বার্থ থাকলেও সেটা তেমন মুখ্য নয়। এই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে অনেক মধুর স্মৃতি, অনেক হাসি আনন্দ বেদনা, অনেক ত্যাগ ও ভালোবাসা। আড্ডায় বসলে হয়তো একটি শব্দের উচ্চারণই তাদেরকে সেই সব স্মৃতিময় দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আড্ডা মানেই তো অনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অগোছালো ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়া। আমার সেই সুযোগ কোথায়, তেমন মানুষই বা কোথায়? আমি বিশ্বাস করি, একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর মানুষ স্বার্থহীনভাবে আর নতুন কোনো সম্পর্ক গড়তে পারে না। এই বয়সের পরের সম্পর্কগুলো বড়ো বেশি পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, বৈষয়িক, প্রফেশনাল। ৩০ বছর হচ্ছে সেই ধরনের বয়স। আমার মনে হয়, এই বয়সটা মানুষের জীবনে এক বড়ো ধরনের ট্রানজিশন পিরিয়ড। তার আগেই সে সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ফেলে, আর পরে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় তার কোনো কোনোটি ভেঙে যায়। ৩০ বছরের পরের বয়সটি কেবলই সম্পর্ক ভাঙার, গড়ার নয়। আমি ঠিক এই বয়সেই ফিরে এসেছি এই অচেনা-অনাত্মীয় শহরে। শান্তা যে আমাকে বাইরে বেরুবার কথা বলে, ও বোঝে না, বেরিয়ে আমি যাবোটা কোথায়?

তার চেয়ে বড় কথা, যে শ্রেণীতে, সমাজের যে স্তরে এখন অঞ্জনের ওঠাবসা সেখানে আর যাই থাক, প্রাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের অংশ। এই বয়সে এ দেশের ছেলেরা সাধারণত এত ওপরে ওঠে না। কিন্তু তার ব্যাপারটা ভিন্ন। তার গলায় ঝোলানো আছে আমেরিকান

ডিগ্রি – যার প্রতি এ দেশের বর্তাশ্রেণীর ব্যক্তিদের আছে এক অযৌক্তিক-অন্ধ-অদ্ভুত মোহ ও শ্রদ্ধা; আছে অনর্গল ইংলিশে কথা বলার প্রায় দুর্লভ ক্ষমতা – যা মাল্টিন্যাশনাল এমনকি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে চাকরি পাওয়ার প্রধান যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়; এরপরও আছে সচিব-ব্যবসায়ী-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দুলাভাইগণ; এবং শ্বশুরপক্ষের অনেক হোমরা চোমরা আত্মীয়-স্বজন। তো, সে এসে পড়েছে এমন একটা জায়গায় যেখানে সবই বড্ড যান্ত্রিক। স্যুটেড বুটেড এক্সিকিউটিভ হয়ে সটান গাড়িতে ওঠো, উঠে পিঠ সোজা করে বসে থাকো, নেমেও সটান হেঁটে গন্তব্যে যাও। গন্তব্যও সেই প্রবৃত্তির – ঝকমকে অফিসরুম, থ্রি-ফোর-ফাইভ স্টার হোটেল, নিদেনপক্ষে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। গন্তব্যে গিয়েও চেয়ারে বসে থাকো সটান হয়ে। খবরদার রিল্যাক্সড হয়ো না, তুমি রিল্যাক্স করতে পারো কেবল পার্টিতে – তাও এই এতটুকু; দুষ্টুমি করতে পারো – তাও এই এবটুখানি; সেখানে নির্বোধ সব লোকজনের স্থূল রসিকতায় হাসি না পেলেও হাসো, এবং ভদ্রতার হাসি ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে চোয়াল ব্যথা করে ফ্যালো। জীবন কি কোনো মশকরার বিষয়, যে হাসি-ঠাট্টা-দুষ্টুমি-ফাজলামিতে মেতে থাকবে? উফ! অঞ্জনের হাঁফ ধরে যায়। মাঝে মাঝে তার জানতে ইচ্ছে করে – এই লোকগুলো কি স্ত্রী-সহবাস করে না? বাথরুমে গিয়ে কি প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারে না? নাকি রোবটের মতো সবল প্রাকৃতিক চাহিদা থেকে কোনো অলৌকিক উপায়ে তারা মুক্তি লাভ করেছে? মাঝে মাঝে দুষ্টুমি চিন্তা মাথায় চাপে অঞ্জনের – এদের পানীয়তে বিশেষ ধরনের কবিরাজি ট্যাবলেট ছেড়ে দিলে কেমন হয়, যেন সঙ্গে সঙ্গে তারা বাথরুমে দৌড়াতে বাধ্য হয়! এক্সিকিউটিভ ভেসে বাথরুমের উদ্দেশ্যে দৌড়ালে, বা বাথরুমে গিয়ে সেগুলো খুলে টুলে বসতে হলে কী রকম দুর্দশায় পড়তে হবে এদেরকে – ভেবে অঞ্জন একা একাই হেসেছে কতবার!

অঞ্জনের ঠিক এই ধরনের পরিবেশ সহ্য হয় না, কিন্তু সে নিরুপায়, ঘটনাক্রমে সে এখন এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। তার বরং ভালো লাগে ভিড়ের মানুষ। মাঝে মাঝে অফিস থেকে বেরিয়ে, কোর্ট-টাই-ব্রিফকেস ড্রাইভারের হাতে দিয়ে – তুমি বাসায় যাও, তোমার আপাকে বলো আমার ফিরতে একটু দেরি হবে – বলে বেরিয়ে পড়ে। কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্য অবশ্য থাকেনা। কখনো হাঁটতে হাঁটতে কোনো বাজারে, কখনো ফুটপাতের সর্বরোগহরা ওষুধ বিক্রেতার জমপেশ বক্তৃতার সামনে, কখনো কোনো লোকাল বাসটপে এসে দাঁড়ায়। বাসস্টপ গুলোতেই সে মজা পায় বেশি। সেখানে মানুষের গাদাগাদি ভিড়, তুলনায় অপ্রতুল বাস, হুড়োহুড়ি লেগেই আছে। সে-ও জোরজার করে কোনো একটি বাসে উঠে পড়ে, যেন কত প্রয়োজন, কত তাড়া তার। উঠে গাদাগাদি মানুষের ভিড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, ঘামে ভিজে তাদের হৈ-হল্লা-চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে থাকে। বাস কোথাও এক মিনিট দাঁড়ালে – দাঁড়াবারই কথা, তবু – যাত্রীরা ড্রাইভারের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে; ড্রাইভারও তেমনি, আশ্চর্য নির্বিকার, যেন গালাগালিটা তাকে নয়, অন্য কাউকে করা হচ্ছে, যাকে সে নিজেও গালাগালিই করতে চায়! আবার ভাড়া নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও বেন্ড বেন্ড আট আনা পয়সার জন্য কন্ডাক্টরের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া লাগায়। আর এসবের কিছুই না হলে যাত্রীরা রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা শুরু করে দেয় নিজেদের মধ্যে, যেন দেশ ও জাতি নিয়ে তারা কতই না দুশ্চিন্তাগ্রস্থ! তারা সবাই মিলে সরকারের বারোটা

বাজিয়ে তেরোটা ঝুলিয়ে দেয়। অঞ্জনের প্রথম প্রথম মনে হতো – লোকগুলো যে এত ক্ষিপ্ত হয়ে আছে সরকারের ওপর, তাহলে এক্ষুনি এই সরকারের পতন ঘটছে না কেন? পরে সে ভেবে দেখেছে, এই লোকগুলোর ক্ষোভ-ক্রোধ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সরকারের ওপর খেপছে তো এই কন্ডাক্টরের ওপর, পরমুহূর্তেই হয়তো সহযাত্রীর ধাক্কা খেয়ে তার ওপর। ক্ষিপ্ততার প্রসঙ্গ এত দ্রুত পরিবর্তিত হলে পরিনামে কিছুই দাঁড়ায় না, কোনো সুসংঠিত বা সুনির্দিষ্ট রূপও পায় না। না পাক, তবু, – অঞ্জনের মনে হয় – এই লোকগুলোর মধ্যে প্রাণ আছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথে যা কিছু বাধা বিপত্তি – সেগুলোকে দুর করতে না পারলেও, তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ আছে। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত নয় – সবকিছু বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয়ার মতো মানুষ নয় তারা। অঞ্জন বাসায় ফিরে শান্তার কাছে গল্প ফাঁদে – জানো, আজকে আমি বাসে উঠেছিলাম – বাসে? গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বাসে! কেন? এর কোনো মানে হয়! – হয়েছে কি বুঝেছো – এবার সে লোকগুলো ক্ষোভ ও ক্রোধের গল্প বলে। শান্তা যথারীতি মন দিয়ে শোনে। একবার শুনেটুনে একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলো ও। বলেছিলো – এই লোকগুলো রাস্তাঘাটে এত ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে কেন জানো? কারণ, তারা জীবনের প্রতি পদে ব্যর্থ – জীবনের ব্যর্থতার সঙ্গে রাস্তাঘাটে রেগে থাকার কি সম্পর্ক বুঝতে না পেরে শান্তাকে জিজ্ঞেস করায় ও বলেছিলো – তারাও হয়তো তোমারই মতো অফিস থেকে ফিরছে, কিন্তু তোমাদের অবস্থানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। অফিসে তুমি আছো ধমক দেয়ার অবস্থানে আর ওরা আছে ধমক খাওয়ার অবস্থানে। হয়তো সারাদিন ভরেই তারা তাদের বসদের ধমক খেয়েছে। বাসায় যে ফিরছে, সেখানেও কি শান্তি আছে? ফিরে হয়তো বউয়ের মুখ ঝামটা খেতে হবে, কারণ বাসায় বাজার নেই, ছেলেমেয়েদের এ মাসের কিংবা গত দু মাসের স্কুলের বেতন দেয়া হয়নি, বাড়িভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালা এসে হম্বিতম্বি করে গেছে বা মোড়ের দোকানে বাকি শোধ করা হয়নি – এই রকম হাজারো সমস্যা সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটির সামনে কেবলই অন্তহীন সমস্যা। কোথাও শান্তি নেই, সহানুভূতি নেই। তারও তো দুঃখ আছে, ব্যর্থতার গ্লানি আছে, অক্ষমতার যন্ত্রনা আছে, অথচ সেগুলো প্রকাশের জায়গা নেই। তার কথা শোনার মতো কোনো মানুষ নেই, তার কষ্ট শেয়ার করার মতো কোনো সঙ্গী নেই। এগুলো তাই সে প্রকাশ করছে রাস্তাঘাটে, বাজারে, বাসে, গলির মোড়ে জটলায়। রাস্তাঘাটে পকেটমার বা ছিনতাইকারী বা বাসাবাড়িতে চোর-ডাকাত ধরা পড়লে – খবর পেয়ে একদল লোক ছুটে এসে প্রবল উৎসাহে ও বিক্রমে অপরাধীকে মারতে থাকে, মারতেই থাকে; তার নিজের জিনিস চুরি বা ছিনতাই হয়নি, তবু হিংস্রভাবে মারতে মারতে হয়তো লোকটিকে তারা মেরেই ফেলে। এই যে হীতাহীত জ্ঞান শূন্য হয়ে এরকম একটা কাজ তারা করে, তার কারণ কি? ব্যক্তিস্বার্থে চূড়ান্ত আঘাত না লাগলে তো কারো পক্ষে এমন হিংস্র হয়ে ওঠা সম্ভব নয়! তাহলে কেন তারা একজন অপরিচিত লোককে পিটিয়েই মেরে ফেলতে পারে? এর কারণ কি জানো? এর কারণ হচ্ছে – ঐ লোকগুলোর মধ্যে পুঞ্জিভুত ক্ষোভ। তারা নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ এবং অবহেলিত মানুষ, ক্ষুব্ধ মানুষ, কোথাও গুরুত্ব না পাওয়া মানুষ, ফলে সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়, নিজেদেরকে গুরুত্বপুর্ণ করে তুলতে চায়।

শান্তার এই ব্যাখ্যায় অঞ্জন খুব চমকিত হয়েছিলো। এভাবে সে ভেবে দেখেনি তো! শান্তার প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিলো। অঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিলো – কি করে বুঝলে তুমি?

শান্তা তখন দুটো ঘটনা বলেছিলো – আমার এক মামা আছেন এই ধরনের। এমনিতে খুব ভালো মানুষ, সবাইকে বেশ স্নেহ করেন, কিন্তু তার সঙ্গে বাইরে বেরুনো খুব ঝুঁকিপূর্ণ। বেরিয়েই তিনি সবার সঙ্গে মেজাজ করা আরম্ভ করেন। আমি একবার সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম – আপনি তো বাসায় তো মেজাজ করেন না, বাইরে বেরুলেই এমন করেন কেন? তিনি বলেছিলেন – সবাই সবসময় আমার সঙ্গে কেবল মেজাজ করে। অফিসে বসের ধমক, ঘরে তোর মামী, এমন কি ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত আমাকে ধমকায়। যেন পৃথিবীর সমস্ত দুরবস্থা আর দুর্ঘটনার জন্য আমি দায়ী। আমারও যে একটা মন আছে, সেটা কারো মনেই থাকে না। আমারও তো মেজাজ খারাপ হতে পারে! সেটা আমি কার ওপর করবো? আর কাউকে পাইনা বলে রাস্তাঘাটে করি।

আরেকবার – আমরা সবাই মিলে বেড়াতে যাচ্ছি, রাস্তায় দেখি জটলা। লোকমুখে শোনা গেলো একজন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। শোনামাত্র কেউ কিছু বোঝার আগেই হাবিব ভাই (শান্তার চাচাত ভাই) দৌড়ে চলে গ্যালো ওখানে, মনের সুখে লোকটিকে পিটিয়ে ফিরে এলো। বাসায় হাবিব ভাইয়ের কোনো সে নেই, বেকার মানুষ, নিতান্তই গুরুত্বহীন – এমন কি কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা পর্যন্ত বলে না, অথচ রাস্তায় এমন একটি কাণ্ড ঘটিয়ে এলো। কেন? কারণ – সেখানে তার পুঞ্জিভূত ক্ষোভের প্রকাশ যেমন ঘটলো, তেমনি লোকজনের কাছে – যেকে তারা অপরিচিত – নিজেকে খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা গেলো। কোথাও যার কোনো গুরুত্ব নেই, সে সুযোগ পেলে সেটা ছাড়বে কেন?

একটি জনগোষ্ঠীর আচরণ ব্যাখায় দুজন পরাজিত মানুষের অভিজ্ঞতাকে এভাবে ব্যবহার করতে দেখে আবারও মুগ্ধ হয়েছিলো অঞ্জন। খুব ভুল করেনি শান্তা। একটি সমাজে হাজার রকম মানুষের বাস, তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র জীবন – এ যেমন সত্যি, তেমনি এও সত্যি যে, তারা সবাই মোটামুটি একটা গড়পরতা জীবনযাপন করে – তাদের জীবনযাপনের বহু অনুষঙ্গ অনেকটাই একরকম। সেই জীবন পদ্ধতিটা কেমন তা বোঝা যায় ওই সমাজটিকে চিনলে। মানুষের সঙ্গে মিশলে জীবনকে অনেকখানিই চেনা যায়। অঞ্জন মিশতেও চায়। শান্তা যা জানে, বোঝে, সে-ও তা জানতে-বুঝতে চায়। অথচ পারে না। এখানকার লোকগুলোকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কেউ কোনো আলোচনা শুরু করলে সে নিশ্চুপই থাকে। সে তো চেনে না এদের। আজকাল মাঝে মাঝে বড়ো দুর্ভাবনা হয় – এই এতদিন পর উদাসপুরও কি তার অচেনা হয়ে গেছে?

নাহ্! সে ভাবে।

অন্তত উদাসপুর কখনো অচেনা হবে না তার। কারণ সে যখন গ্রামের কথা বলে তখন তার বর্ণনায় কি যেন থাকে! কি থাকে? শান্তার তো মনে হয় – গ্রামের কথা বলতে গেলে অঞ্জনের চোখ কোনো এক অচেনা স্বপ্নে মেদুর হয়ে ওঠে। কোন সে স্বপ্ন?

৫

কি থাকে অঞ্জন নিজেও কি জানে? উদাসপুর নামটিই কেন তার মধ্যে এমন সুবাতাস বইয়ে দেয় – সে বোঝে না। এক অজপাড়াগাঁ, সভ্যতার ছোঁয়াবিহীন প্রাগৈতিহাসিক জীবন যাপনকারী মানুষ – এসবের মধ্যে সে কেন নিজেকে দেখতে পায়? ওই গ্রাম, ওই জীবনের সঙ্গে তার সামান্যতম যোগাযোগও তো নেই আজ প্রায় ১৫/১৬ বছর!

ছোটোবেলায় – তখন হাইস্কুলে পড়ি – একদিন মনোযোগ দিয়ে অংক করছিলাম । অংক করার সময় গান না শুনলে আমার মন বসতো না বলে আব্বা আমাকে একটা ছোট্ট রেডিও কিনে দিয়েছিলেন – শুধু আমার জন্যই। সেই প্রথম বড়ো ধরনের কোনো শখের বস্তু একদম নিজের করে পাওয়ায় সেটি আর কাছ ছাড়া করতাম না। অন্যান্য সবার জন্য আরেকটা রেডিও আগে থেকেই ছিলো – সেটা সাইজে বড়, নিজের একটা হওয়ার ফলে ওটা আমি ছুঁয়েও দেখতাম না। ওই দুর্গম অঞ্চলে তখন পর্যন্ত রেডিওই ছিলো একমাত্র বিনোদন মাধ্যম। শুনেছি – এখন সেখানে টিভি-ভিসিপি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সিনেমা হলও নাকি হয়েছে; তখন এসবের বালাইও ছিলো না, একটা রেডিও থাকা-ই ছিলো বিশাল ব্যাপার। নিজের মালিকানাধীনে একটা রেডিও পেয়ে আমি যে কতটা খুশি হয়েছিলাম, সেটা বলে বোঝানো যাবে না। তো, ওই দিন, একটা গান হচ্ছিলো – *ও আমার দেশের মাটি তোমার তরে ঠেকাই মাথা....* । এই দিনটির কথা আমার বিশেষভাবে মনে থাকার একটাই কারণ, আব্বা কোনোদিন যা করেন না সেদিন তাই করলেন – পড়ার টেবিল থেকে আমাকে ডেকে ওঠালেন, বললেন – চলো একটু হেঁটে আসি । আব্বা মেঠোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জমি দেখাচ্ছিলেন। এটা ওমুকের জমি, এটা ওমুকের, এইটা আমাদের। টের পাচ্ছিলাম – আব্বা যতবার 'এইটা আমাদের' বলছেন ততবার আমার মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে। জমির মালিক হওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব আছে এই বিষয়বুদ্ধি তখন নিশ্চয়ই আমার ছিলো না (বস্তুতপক্ষে আমার মধ্যে কোনো বিষয়বুদ্ধিই ছিলো না, এখনও যে খুব একটা আছে তা-ও বলা যায় না), তবু ওই আমাদের শব্দটির মধ্যে এমন কি ছিলো যে, আমার অনুভূতি এমন বদলে যাচ্ছিলো? এরপর আব্বা একটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে – এই জমিটা তোমার মায়ের – বললে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, হঠাৎ 'আমাদের' শব্দটির বদলে শুধুমাত্র মা' র কথা বলা হলো কেন? এই এতদিন পরেও আমি ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবোনা, তখন আমার অনুভূতিটা ঠিক কেমন ছিলো। 'তোমার মায়ের জমি' শব্দগুচ্ছ নিশ্চয়ই অমুকের জমি, তমুকের জমির মতো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের অনুভূতি সৃষ্টি করেনি, আবার সেই অনুভূতি ঠিক 'আমাদের জমির' অনুভূতির মতোও নয়। আরো অনেক পরে যখন নিজের কাছেই ঘটনাটির ব্যাখ্যা চেয়েছি, উপলব্ধি করেছি, 'আমার' এবং 'আমাদের' শব্দ দু'টো মানুষকে ঘটনা, পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, এমনকি বস্তুর সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট করে দেয়। এতদিন আমেরিকা থেকেছি তবু

ওখানকার কোনোকিছু আমার বা আমাদের বলে ভাবতে পারিনি বলেই তো ওখানকার অসম্ভব সুন্দর সুষারপাতের চেয়ে উদাসপুরের ছন্নছাড়া বৃষ্টিপাতকে শতগুণ সুন্দর বলে মনে হয়েছে আমার। কিন্তু 'মা' শব্দটিকে আমার কাছে এই দুটো শব্দের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী বলে মনে হয়। মা তো এমন এক বিশেষ শব্দ, সন্তানের ভেতর যা অভূতপূর্ব অনুভূতির জন্ম দেয়, যে শব্দটি সন্তানকে দুরতম গ্রহ থেকেও নিজ মাটিতে ফিরিয়ে আনার শক্তি রাখে। আর দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয় বলেই না মানুষ সেই মায়ের জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না।] আব্বাকে অনেকক্ষণ ওখানটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি কি করবো বুঝতে না পেরে মনোযোগ দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বিনা কারণেই জিজ্ঞেস করেছিলাম –

মাটির কি কোনো গন্ধ আছে আব্বু?

আছে বাবা।

দেখি?

দ্যাখো।

আমি মাটি হাতে তুলে নিয়েই গন্ধ শুঁকতে পারতাম – সেটাই স্বাভাবিক হতো, কিন্তু আমার যে কি হলো – হাঁটু গেড়ে সেজদার ভঙ্গিতে মাটিতে কপাল ঠেকালাম; সম্ভবত একটু আগে শোনা গানটির কোনো প্রভাব আমার ভেতরে কাজ করে থাকবে, মনে হলো আমি আমার দেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছি। তখন ওই মাটি মা র নয়, আমাদের নয় – আমার দেশের মাটি হয়ে উঠলো আমার কাছে। পরে যখন ঘটনাটি ভেবে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে, ওই সময় আব্বাকে ওই নির্দিষ্ট প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করাটা কোনো অকারণ ঘটনা ছিলো না। বরং প্রকৃতির যে রহস্যময় কার্যকারণসমূহ মাঝে মাঝে মানুষকে হতবাক করে দেয়, মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় অনিবার্য, অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর সামনে– ওটাও ছিলো তেমন কিছু। নইলে ওই সামান্য প্রশ্ন কেন আব্বার অর্গল খুলে দেবে, আর তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর দর্শনের কথা ক্রমাগত আমার মতো একজন কিশোরকে শুনিয়ে যেতে থাকবেন, আর আমার ভেতরে আসতে থাকবে বয়সের চেয়ে বেমানান গাম্ভীর্য ও একাকীত্ব?)

দেশ জিনিসটি কি, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিলো না আমার। ভূগোল বইতে দেশের সীমারেখার বর্ণনা পড়ে নিশ্চয়ই দেশ বিষয়টি উপলব্ধিতে আসার কথা নয়! বরং ওই মুহূর্তে প্রথমবারের মতো আমার মনে হয়েছিলো – এই হচ্ছে দেশ, যার মাটিতে মাথা রাখলেও অদ্ভুত এক শিহরণ জাগে। আমার এত ভালো লাগছিলো যে, সহসা মাথা তুলতে ইচ্ছে করছিলো না; আর অবাক লাগছিলো এই ভেবে যে, এই মাটিতে এত খেলাধুলা করি, গড়াগড়ি করি, কই, কোনোদিন তো এমন করে মাটির গন্ধ পাইনি! জানি না কতক্ষণ পর মাথা তুলেছিলাম, তুলে দেখি আব্বার চোখ ভেজা। আব্বা কাঁদছেন! আমি উঠে দাঁড়ালে আব্বা আমাকে এক হাতে পেঁচিয়ে হাঁটতে থাকেন। যেন আমার মনের কথাটি বুঝে গেছেন এমন ভঙ্গিতে বলতে থাকেন –

এই যে এতক্ষণ ধরে এটা অমুকের, ওটা অমুকের জমি বললাম, আসলে কোনোটাই কারোর নয়, অথবা সবারটা সবার। এখন তুমি ছোট, সব কথা বুঝবে না, কিন্তু মনে রেখো, উদাসপুরের সব মানুষ মিলে একটি মাত্র পরিবার। এই যে দেখছো আ'ল দিয়ে জমিগুলোকে পৃথক করা হয়েছে, এগুলো তুলে দিলেই সবচেয়ে ভালো হতো। সবাই মিলে একটি জমির মালিক হতো, সেখানে সবাই মিলে কাজ করতো, ফসলগুলো সবাই মিলে ভাগ করে নিতো। শুধু উদাসপুর কেন, পাশের গ্রামে যাও, কিংবা তারও পাশের গ্রামে – এভাবে সারাদেশের জমির আ'ল গুলো তুলে দিলে, সীমানা পৃথক করা প্রাচীরগুলো ভেঙে ফেললে – এদেশের সব মানুষ মিলে একটি মাত্র জমির মালিক হতো, সবাই মিলে সেখানে কাজ করতো, ভোগও করতো সবাই মিলে।

এটা কি সম্ভব আব্বু? জমির মালিকরা কি তা মেনে নেবে? ওদের ক্ষতি হয়ে যাবে না?

এখন হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু একসময় সম্ভাবনা তৈরী হয়েছিলো। তোমার কি যুদ্ধের কথা মনে আছে বাবা?

না আব্বু, ছোট ছিলাম তো...

হ্যাঁ, তুমি তো তখন অনেক ছোট। তো, সেই যুদ্ধের সময় এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিলো। তখন মানুষ সবকিছুই 'আমাদের' বলে ভাবতে শিখেছিলো। এখানকার অনেকেই তো যুদ্ধে গিয়েছিলো, বেশ্ট বেশ্ট শহীদও হয়েছে, যেমন – উদাসপুরের রতন, রামকৃষ্ণপুরের মিরাজ – ওরা তো আমাদের ঘরেরই ছেলে। ওদের মতো সবাই যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে তা নয়, কিন্তু সবাই নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। দু-একটা ঘটনা শোনো। একবার পাকিস্তানিরা একদল মুক্তিযোদ্ধাকে ধাওয়া করে উদাসপুর পর্যন্ত নিয়ে এলো। অবস্থাটা এরকম যে কোথাও মুক্তিযোদ্ধাদের নামগন্ধ পর্যন্ত পেলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, বেহিসেবি লোকজন মারছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের বাড়িটা পোড়ালো ওই সময়ই। তো, এরকম একটি সময়ে বুদ্দুসের মা একজন অচেনা মুক্তিযোদ্ধাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলো। নিজে অভুক্ত থেকে তাকে খাওয়ালো। হতদরিদ্র ওই বুড়ির মানসিকতাটা বোঝা দরকার। আমি পরে ওই বুড়িকে জিজ্ঞেস করেছিলাম – ধরা পড়লে তো ওরা তোমাকে মেরে ফেলতো, তোমার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতো – এসব জেনেশুনে ওই অচেনা ছেলেটিকে তুমি তোমার ঘরে আশ্রয় দিতে গেলে কেন? বুড়ি উত্তরে কি বলেছিলো জানো? বলেছিলো – হার্মাদগুলান আমাগো পুলাপানগুলারে মাইরা সাফ কইরা ফালাইলো, এইডা কি সওন যায়? আমার উপায় থাকলে আমি সব ছাওয়ালগুলারে আমার ঘরে রাইখা দিতাম। ... অর্থাৎ ওই অচেনা ছেলেটিও বুড়ির কাছে 'আমাদের ছেলে' হয়ে উঠেছিলো। ... কিংবা সেই অন্ধ ভিখারি পরীর মা র কথাই ধরো। ওই বুড়ির নিজের বলতে কিছু ছিলো না। সব বাড়িই ওর নিজের বাড়ি, সব ঘরের হাড়ির খবর ওর জানা। ওকে কিন্তু রাজাকাররা অনেক টাকাপয়সার লোভ দেখিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো খবর বের করতে পারেনি। সে শুধু বলতো – আমি আন্ধা মানুষ বাজান, আমি কিছু জানি না। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের এসে ঠিকই বলে দিতো আজ তাকে কে কি জিজ্ঞেস করেছে, উত্তরে সে কি বলেছে। এই আচরণের ব্যাখ্যা কি? বড় হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করো। আমি শুধু আমার ব্যাখ্যা বলতে পারি। ওই অন্ধ বুড়ির কাছেও মুক্তিযোদ্ধারা ছিলো আমাদের ছেলে। আর এই আমাদের ছেলেরা যে

জীবন হাতে নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলো, সে কি শুধু নিজের জমি-জমা-ঘর-বাড়ি রক্ষার জন্য? এদের অনেকেরই তো নিজস্ব কোনো জমিই ছিলো না। তারা তাহলে কেন জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলো? হ্যাঁ, তারা আসলে আমাদের দেশটিকে বাঁচাতে চেয়েছিলো। তখন এভাবেই, সবার কাছে, সব ক্ষেত্রে 'আমাদের' ধারণাটিই প্রধান হয়ে উঠেছিলো। যুদ্ধের পর এই মহা শক্তিশালী ধারণাটি ব্যবহার করা হয়নি, বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করা হয়নি, বরং সুচারুভাবে তা ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ, রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এই ধারণাকে ভয় পেতো। তারা সবাই এর বিরুদ্ধ পক্ষ। আর এটাই বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, যে কনসেপ্টটির ওপর ভর করে দেশটি স্বাধীন হলো, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যারাই এই রাষ্ট্রের ক্ষমতায় গেছে তাদের সবাই এই কনসেপ্টটির বিপক্ষের মানুষ। যদি ওটাকে ব্যবহার করা হতো তাহলে খুব অন্যরকম হতো বাংলাদেশের চেহারা। যদি যুদ্ধের পর বলা হতো, এখন থেকে আমার বলে কিছু থাকবে না, সব কিছু আমাদের হয়ে যাবে – তাহলে এতদিনে বাংলাদেশে কোনো গরীব মানুষ থাকতো না। এসব বিষয় এখনই ঠিক বুঝবে না, বড় হয়ে বুঝতে চাইলে বুঝতে পারবে।

এখন – এই এতদিন পর – নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, আব্বা ঠিক এভাবেই এবং হুবহু এই কথাগুলোই বলেছিলেন কী না, কিন্তু আমার ভেতরে বিষয়গুলো এভাবেই গেঁথে আছে। ওই দিন বা পরে কোনো একদিন তিনি আরো বলেছিলেন,

তুমি নিশ্চয়ই অনেক বড়ো মানুষ হবে – আমি অন্তত সেরকমই স্বপ্ন দেখি – তখন এই গ্রামকে ভুলে যেও না। যেখানে যেভাবে থাকো না কেন, মাঝে মাঝে গ্রামে আসবে। মনে রেখো – এটাই তোমার শেকড়; নিজেকে, দেশকে, পৃথিবীকে বুঝতে হলে আগে শেকড়টাকে ভালোভাবে চিনে নেয়া দরকার। এখানে আসবে, মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, দেখবে তোমার অভিজ্ঞতা বদলে যাচ্ছে, দর্শন বদলে যাচ্ছে। যেমন, যুদ্ধের ব্যাপারটাই ধরো। এই মানুষগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত জানে না যে, যুদ্ধটা ঠিক কেন হয়েছিলো। তখনও জানতো না, এখনও জানে না। তারা শুধু বুঝতে পেরেছিলো – এ হচ্ছে তাদের নিজেদের যুদ্ধ। আজ থেকে ২০ বছর পরও এসে তুমি যদি এ গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী লোককে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস কর – তারা হয়তো তখনও যুদ্ধের কারণটির কথা বলতে পারবে না, কিন্তু এমনভাবে স্মৃতিচারণ করবে যেন গতকাল মাত্র ঘটনাটা ঘটে গেছে। যুদ্ধের কারণ তারা জানে না, কিন্তু যুদ্ধদিনের সব স্মৃতি তারা তাদের মনে গেঁথে রেখেছে। বড় হলে হয়তো দেখবে শহরের মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে – রেডিও-টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠান, সংবাদপত্রের বিশেষ ইস্যু, রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ বাণী, আর রাজনীতিবীদদের ফায়দা লোটার বিষয়বস্তু। তখন যদি তোমার মূল বিষয়টি বুঝতে ইচ্ছে করে, তাহলে গ্রামে এসো। মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধারা যদি কোথাও না-ও থাকে – এদেশের সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে পরম মমতায় লালিত হবে চিরটা কাল। এসব কথা ভেবে হয়তো তুমি পরে অবাক হবে যে, কেন আমি বলছি – মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধারা যদি কোথাও না-ও থাকে! বাংলাদেশে থাকবে আর মুক্তিযুদ্ধ থাকবে না তা-ও কি হয়? হয় না। হওয়া উচিত নয়। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে এরকম কথা বলতে বাধ্য করছে। যুদ্ধ হয়েছে মাত্র ১৪ বছর, অথচ এরই মধ্যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে

যুদ্ধের অধিকাংশ বীরদের হত্যা করা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের মূল অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে দেবার সমস্ত আয়োজন পাকাপোক্ত করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে সেটা তুমিও বুঝতে পারবে। আমাদের সবচেয়ে বড়ো সংকটটি কোথায় জানো? বড়ো সংকটটি হচ্ছে – যারা এই সব হত্যাকান্ড আর ধ্বংসপ্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তারাই প্রকাশ্যে অথবা নেপথ্যে দেশটাকে চালাচ্ছে। নিজেদের স্বার্থেই ওরা তাই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন আর অর্জনকে মুছে দিতে চাইবে। পারবে না, কিন্তু নষ্ট করে দেবে। কিন্তু তখন তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, এদেশের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি মানুষের কাছে আসবে, তাদের কথা শুনলেই বুঝতে পারবে কী ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ইতিহাসের নতুন পাঠ নিতে পারবে তাদের কাছ থেকেই। মনে রেখো – এই গ্রামে রতন নামে যে ছেলেটি শহীদ হয়েছে, তার মা রতনের রক্তমাখা শার্টটি এতোদিন পরও সযত্নে তুলে রেখেছে। এটা একটা প্রতীক। যুদ্ধের স্মৃতি আর যোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসার প্রতীক। যত কিছুই ঘটুক না কেন, এমন কি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ওই বিরুদ্ধপক্ষ যদি দেশটাকে আবার পাকিস্তানও বানিয়ে ফেলে, তবু পৃথিবীর কোনো শক্তিই রতনের রক্তমাখা শার্ট ওর মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। আর যদি নেয়-ই তাহলে জেনে রেখো – আরেকটি যুদ্ধ হবে তখন – ওই যুদ্ধ অনিবার্য।

সেই সুদূর কৈশোরে এতসব কঠিন কঠিন কথাবার্তা আমি ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারিনি। কথাগুলো স্বয়ং এমনই ছিলো তা-ও হলফ করে বলা যায় না। তবে, পরে, বাবাকে ভাবতে গিয়ে, তাঁকে বুঝতে চেয়ে, তাঁর কথাগুলোকে মনে করতে করতে এভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে।

ওটা ছিলো শুরু। তারপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আরো বহু বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন আব্বা। মনে হয়, নানা বিষয়ে আমাকে শিক্ষিত করে তোলাটাকে তিনি একটা মিশন হিসেবে নিয়েছিলেন। হয়তো আমাকে নিয়ে তাঁর একটি বড়ো মাপের স্বপ্নও ছিলো, আমি তা খানিকটা বুঝিও। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সফল হয়নি – সে তো বলাই বাহুল্য। যাক গে, তাঁর কথাগুলো যতটুকু মনে আছে তা থেকে বুঝতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিলো অগাধ জ্ঞান। রীতিমতো পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। এখন আমি কত বই পড়ি, কিন্তু তাঁর বলে যাওয়া কথাগুলোর মতো গভীর চিন্তার খোরাক জোগানো বিষয় খুব কমই পাই।

বাবার সময় যে শেষ হয়ে আসছিলো, সম্ভবত তিনি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। নইলে এত তাড়াহুড়ো করে একজন কিশোরকে সব বিষয়েই শিক্ষা দিতে চাইবেন কেন?

আমি ছোটোবেলা থেকেই আমার মামার বাড়ির লোকজনের কাছে আব্বার ব্যাপারে নানারকম অভিযোগ শুনে এসেছি। আব্বা যে তাঁর অতি উজ্জ্বল ক্যারিয়ার আর সামাজিক প্রতিপত্তির সম্ভাবনাকে পায়ে ঠেলে গ্রামে এসে বসেছেন, এটা নিয়ে তাদের ক্ষোভ আর বিদ্রূপের অন্ত ছিলো না। আব্বা এই বিষয়েও তাঁর নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন আমার কাছে –

আমি তোমাদের কথা ভেবেই এমনটি করেছি। চাকরি করলে হয়তো আমি সামাজিকভাবে এলিট শ্রেণীভুক্ত থাকতাম, তোমরা আমার পরিচয়ে গর্ব বোধ করতে পারতে, কিন্তু তোমরা যা হারাতে তা হচ্ছে তোমাদের শৈশব কৈশোর। এর মূল্য যে কী তা একমাত্র বয়স বাড়লেই বোঝা যায়। মানুষের আছেই এই একটিমাত্র

সম্পদ। যত বয়স বাড়তে থাকে মানুষ তত বেশি অসহায় আর নিঃসঙ্গ হতে থাকে, তার সম্পদ বলতে ওটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, শেষ পর্যন্ত ওখানেই সে আশ্রয় নেয়, ওখানেই সে গড়ে তোলে তার নিরাপদ বাড়িঘর। আমার ছিলো বদলির চাকরি, সেটা চলতে থাকলে তোমরা একেকজন একেক জায়গায় বড় হতে। ছোটোবেলার কথা ভাবতে চাইলে তোমাদের চোখে নির্দিষ্ট কোনো দৃশ্যপট ভেসে উঠতো না; একেকজনের চোখে ভাসতো একেক দৃশ্য, ভাগাভাগি করে নেয়ার মতো কমন কিছুই থাকতো না তোমাদের। উদাসপুরের প্রতিও তোমাদের কোনো মমতা জন্মাতো না, অথচ এই গ্রামই হচ্ছে তোমাদের প্রকৃত শেকড়, তোমাদের পূর্ব পুরুষের অতি ভালোবাসার গ্রাম। তাছাড়া শহর সবসময়ই প্রাণহীন – সব আছে সেখানে, শুধু প্রাণ নেই। তোমরা গ্রামে বড়ো হয়েছো – এটা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা সমস্যা হতে পারতো, যদি তোমরা নাগরিক কার্টেসি বা ম্যানারটা না জানতে। তোমরা তা-ও শিখেছো। আমাদের বাড়ির পরিবেশটা নাগরিক, ভাষাটাও। আমি চিরকাল তোমাদেরকে গ্রামে থাকতে বলবো না, শহরে তো যেতেই হবে । যখন যাবে, দেখবে – তোমাদের সবই আছে, কিন্তু শহরের মানুষের প্রাণ নেই।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি একজন মানুষের চিন্তাভাবনা কতটা সুদূরপ্রসারী হলে তিনি এমন একটা কাজ করতে পারেন। সত্যিই তো, উদাসপুর নামটিই আমাদের চার ভাইবোনের সম্মিলিত সম্পদ। একটি ঘটনার শুধুমাত্র উল্লেখই আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যায় – এমনকি ঘটনাটির পুরো বর্ণনারও দরকার হয় না।

আমরা সম্ভবত প্রাণসম্পন্ন হয়েছিলাম। শহরে এসেও সবকিছুর সঙ্গে ঠিক ঠিক মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

স্কুল পাশ করে আমি এসে ভর্তি হলাম শহরের নামজাদা কলেজে। আমিই সর্বকনিষ্ঠ। তার আগেই পর্যায়ক্রমে এসে গেছে তিন বোন। আপার বিয়ে হয়ে গেছে, কিছুদিন পর আপুনিরও বিয়ে হলো প্রতিষ্ঠিত সফল পাত্রদের সঙ্গে – প্রধানত মামাদের সক্রিয় উদ্যোগে। এবার তাঁরা আর ভুল করেননি। এরা অন্তত সব ছেড়ে-ছুঁড়ে গ্রামে চলে যাবে না।

ওই বছরই আব্বা মারা গেলেন। মাকে ধরে-বেঁধে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো। ওইভাবে যখন তখন উদাসপুর যাওয়ার তাড়া আর রইলো না কারো মধ্যে।

কলেজ পাশ করার পর সবাই উঠেপড়ে লাগলো আমাকে বাইরে পাঠানোর জন্য। দেশ জুড়ে তখন তাণ্ডব চলছে। খুব যে সচেতন ছিলাম এ সব বিষয়ে তা নয়, কিন্তু আব্বার গড়ে দেয়া নানারকম কনসেপশন আমাকে আগ্রহী করে তুলেছিলো বিষয়গুলো বোঝার জন্য। কেন এত হরতাল অবরোধ হচ্ছে দেশে? একটি জবরদখলকারী সরকারকে হটানোর জন্য যারা আন্দোলন করছে তারাও যে খুব ভালো মানুষ তা তো নয় – বরং এরাও ক্ষমতায় থাকার সময় মুক্তিযুদ্ধের ওই আমাদের কনসেপ্টটিকে ধ্বংস করেছিলো। নতুন করে তারা ক্ষমতায় এলে এমন কি উপকার হবে এই দেশের? কিন্তু এসব ভাবাভাবির সময় হলো না আমার। দেশে থাকার প্রবল ইচ্ছাও হার মানলো বোনদের অব্যাহত চাপের কাছে। তখন বয়স ছিলো অল্প, আমার মতামতের কোনো মূল্যই ছিলো না; আমাকে যেতেই হলো; আর যাওয়ার একবছরের মাথায় মাকে

হারালাম। জানার পর বোনদের ওপর ভয়ানক রাগ হলো, আর শুরু হলো আমার উদ্ভ্রান্ত জীবন। এই এতদিন পর দেশে ফিরেছি – এখন সেই রাগ অনেকটাই পড়ে গেছে, তবু মা নেই এই কথাটি কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারিনি এখনো।

অঞ্জন এইসব কথাবার্তা প্রায় সবই বলেছে শান্তাকে। তবু শান্তা এখনো ধরতে পারেনি – অঞ্জনের কষ্টটা ঠিক কোথায়! সে তাই প্রায়ই বলে – চলো আমরা উদাসপুর থেকে ঘুরে আসি – কারণ, তার ধারণা, ওখানে গেলেই বোঝা যাবে, অঞ্জন কেন এরকম। কিন্তু অঞ্জন কিছুতেই নিয়ে যাচ্ছে না। সরাসরি না করছে না, আবার কোনো উদ্যোগও নিচ্ছে না। শান্তা অপেক্ষা করে আছে কবে অঞ্জন নিজেই বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলবে।

৬

আব্বা নেই, মা-ও চলে গেছেন – কার কাছে ফিরবো আমি, কার কাছে? – এই ধরনের এক তীব্র শূন্যতা অঞ্জনের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো। বোনদের ওপরে যেহেতু ভয়ংকর রাগ আর ক্ষোভ জমেছিলো, ফলে মনে হতো – তার আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে। এবার আপুনি গিয়ে না নিয়ে এলে হয়তো আর কোনোদিন আসাই হতো না, জীবন কেটে যেত ওই রকম উদ্বাস্তুর মতো। এখন যে ফিরে এসে থিতু হয়েছে, চাকরি-বাকরি-সংসার করছে, তবু মাঝে মাঝে ওই রকম একটি শূন্যতাবোধ তার মধ্যে এখনো কাজ করে। এই শূন্যতা হয়তো শুধুমাত্র মা-বাবার মৃত্যুজনিত কারণেই নয়, বরং আরো অনেক কিছু – আরো কোনো গভীর কারণ যেন নিহিত আছে এর পেছনে। এই শহরে তার কেউ নেই – কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্যি নয়, বোনরা ছাড়াও মামা-খালারা আছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা আছে, কিন্তু বাবার প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য অঞ্জন কখনো তাদেরকে আপনজন বলে মানতে পারেনি। এত শিক্ষিত, সচেতন, জ্ঞানী, ও সজ্জন একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র চাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়ার অপরাধে বাবাকে, এমনকি মাকেও যে বিপুল পরিমাণ বিদ্রূপ ও গঞ্জনা সইতে হয়েছে, – অঞ্জন তার সামান্যই প্রত্যক্ষ করেছে, তবু – এর জন্য সে মামা খালাদের ক্ষমা করতে পারে না। জীবনযাপন নিয়ে মহাব্যস্ত, সারভাইভ করার জন্য হা পিত্যেশ করতে থাকা এইসব আত্মীয়স্বজন বাবাকে কোনোদিন বুঝতেই চায়নি। কতটা মানসিক জোর থাকলে একজন মানুষ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে পারে – এরা কখনো সেটা ভেবেই দেখেনি। হ্যাঁ, বাবার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ার অধিকার তাদের নিশ্চয়ই আছে – সে-ও সব ব্যাপারে বাবার সঙ্গে একমত পোষন করে না – তাই বলে এমন অপমান করা কেন? যে কোনো মানুষের অধিকার আছে তার

নিজের মতো করে জীবন যাপন করার – অন্তত সেটা যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। তো, বাবা যদি ওই জীবনকেই ভালো মনে করে থাকেন তাহলে তাকে দোষ দেয়া যায় না, অপমান করা তো দূরে থাক। এদের জন্য অঞ্জনের করুণা হয়, বোনদের অনুরোধ-মিনতি সত্ত্বেও সে তাই এদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার প্রয়োজন বোধ করে না। ওদিকে বাবা তার পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে অঞ্জনের কোনো চাচা ফুপুও নেই। থাকার মধ্যে এক দূর সম্পর্কের ফুপু – কত দূরের তা সে ঠিক জানে না, অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সেই থেকে তাদের বাড়িতে আছেন – বাড়িতে যাওয়া হয়না বলে তার সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বাকি রইলো তিন বোন আর শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়স্বজন। বোনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো – অনেকদিন এদের ওপর রেগে ছিলো বলে এখন তার অনুতাপ হয় – বোঝে, সে ছাড়া বোনদের আশ্রয় বলতে আর কোনো স্থান নেই। কিন্তু এ শুধু বোনদের বেলায় সত্যি, দুলাভাইদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক খুব একটা সহজ নয়।

আমেরিকা যাওয়ার বছর চারেক আগে আপার বিয়ে হয়েছিলো রাশভারি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে – অঞ্জন প্রথম থেকেই তার সঙ্গে সহজ হতে পারেনি। দায়িত্বশীল তিনি – স্নেহপ্রবণও, ছোট দুই শালীর বিয়ে, শ্যালকের বিদেশযাত্রায় তার ভূমিকাই ছিলো প্রধান। এখন তিনি একটি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব – বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গাম্ভীর্য বাড়ছে। আপার বাসায় গেলে দুলাভাইয়ের সঙ্গে সামান্যই কথা হয় তার। আপার সঙ্গেই যা কিছু কথাবার্তা – এমনকি ভাগ্নে-ভাগ্নি গুলোও খুব একটা কাছে চাপে না, মামাকে তারা এই প্রথমবারের মতো দেখছে, কিন্তু কাছে চাপার মতো ভরসা পাচ্ছে না, তাদের যা কিছু খাতির বরং শান্তার সঙ্গেই। আপা তার স্বামী-সংসার-সন্তান নিয়ে ভালোই আছে। ব্যস্ত, সুখী গৃহবধু – অঞ্জনের দেখতে ভালোই লাগে।

আপুনির বিয়ে হয়েছিলো সে যাবার বছরখানেক আগে, দুলাভাই এখন বড়োমাপের ব্যবসায়ী – এই শহরে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রায় সবাই তাকে চেনে; খুব ব্যস্ত, ঘটনাক্রমে হয়তো মাঝে মাঝে অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু কথা হয় সামান্যই। আপুনিও আপার মতো তার সংসার নিয়ে মহাব্যস্ত এবং খানিকটা অস্থিরও। অঞ্জনের মনে হয় – তার এই বোনটা হয়েছে মা র মতো – ওই রকম শান্তশিষ্ট; এবং জীবনের ছোটখাটো প্রাপ্তিগুলোও ওর কাছে বিশাল।

অঞ্জনের সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক বুবুর সঙ্গেই। এমনিতেও পিঠেপিঠি ভাইবোন বলে বুবুর সঙ্গে তার অন্যরকম বোঝাপড়া, স্মৃতির ভাগাভাগি । দুলাভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এবং বেশ আদর্শ শিক্ষকের ভাবভঙ্গি তার মধ্যে সর্বদা বিরাজমান। অঞ্জনের সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঠাট্টা-দুষ্টুমি করলেও এমনিতে তিনি চুপচাপ, এবং সম্ভবত খানিকটা নির্জনতাপ্রিয়। বুবুর বিয়ে হয়েছে সে আমেরিকা থাকতে, ফেরার আগে এই দুলাভাইয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই হয়ে ওঠেনি – কিন্তু তাকেই সে সবচেয়ে পছন্দ করে। সে সবচেয়ে বেশি যায়ও এই বাসায়ই এবং সেটা বুবুর সঙ্গে আড্ডার লোভে।

বোনদের বাসায় সে যেতে পছন্দ করে, যদিও তারা নিজ নিজ সংসার নিয়ে মহাব্যস্ত, তবু একটুখানি সময় চুরি করে ছোটবেলায় ফিরে যেতে সবাই খুব আনন্দ পায়। অঞ্জন অবশ্য টের পায় – বোনদের মধ্যে এক ধরনের সূক্ষ্ম অসহায়ত্ব আছে। থাকারই কথা। মা-বাবা নেই, একজন টিপিক্যাল বাঙালি মেয়ে, ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত

থাকতে যে পছন্দ করে, মা-বাবা না থাকাটা তার জন্য একটা বড় সংকট। মা-বাবা নেই মানে তাদের যাওয়ার জায়গা নেই। স্বামীর সঙ্গে নিশ্চয়ই কখনো কখনো এদের ঝগড়া-টগড়া হয়, মন কষাকষি হয়। তখন রাগ করে দু চারটে দিন বাপের বাড়ি কাটিয়ে যাবার সুযোগ এদের নেই। বাংলাদেশের এমন কোন মেয়ে আছে – স্বামীর সঙ্গে রাগ-অভিমান করে দু-চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে আসেনি, আর স্বামীরা বউদের রাগ ভাঙাবার জন্য শ্বশুর বাড়ি ছুটে আসেনি! এদের সেই সুযোগ নেই। হয়তো সমস্ত রাগ-অভিমান-মনোমালিন্য তারা চোখের জলে ধুয়ে ফেলেছে। কথাটা ভাবলেই অঞ্জনের খারাপ লাগে। আহা, আমার এত প্রিয় বোনদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, কোনো নির্ভরতা বা সান্ত্বনার আশ্রয় নেই। আমি তো থেকেও নেই, ভাই হয়েও যথার্থ ভূমিকা আমার কোনোদিনই পালন করা হলো না। কিন্তু এই এতদিন পর এসে – অঞ্জন যদিও জানে, বোনদের কাছে তার গুরুত্ব খুব বেশি – হঠাৎ করে সবকিছু বদলে ফেলা যায় না। বোনরা এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, স্বামীর সঙ্গে রাগটাগ করে দু চারদিনের জন্য – বাপ না থাকুক – ভাইয়ের বাড়িতে চলে আসার কথা হয়তো তাদের মনেই পড়ে না। এমনকি সব ভাইবোন মিলে একসঙ্গে একটি দীর্ঘ সময়ও কাটানো হয় না বলতে গেলে। ওটা সম্ভবত আর হবারও নয় – মা বাবা না থাকলে ভাই বোনদের মধ্যে সুতো কেটে যায়, সেই সুতো আর জোড়া লাগে না কোনোদিন।

অঞ্জনের সমস্যা তাই জটিল হয়ে চলেছে দিনদিন। এই শহরে এক বোনদের বাসায় যেতেই সে পছন্দ করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না – ওদের এতসব ব্যস্ততার মধ্যে দীর্ঘ আড্ডার লোভে গিয়ে হাজির হতে একটু খারাপই লাগে। এ হচ্ছে ফর্মালিটি – বোধো সে, আমেরিকায় থাকার ফল – যা তাকে বোনদের সঙ্গেও কার্টেসি, ফর্মালিটি ইত্যাদি করতে শিখিয়েছে।

সে অবশ্য শান্তাদের বাসায়ও যেতে বেশ পছন্দ করে, ওখানে তার খুব কদর, শান্তার আম্মা-আব্বাও খুব স্নেহপ্রবণ, ভালোমানুষ। কিন্তু অঞ্জন সবচেয়ে উপভোগ করে শান্তার দাদার সান্নিধ্য। হয়তো এর কারণটি এই যে, ওখানে গেলে অঞ্জন তার দাদা আর বাবার অনেক অজানা গল্প শোনার সুযোগ পায়। দাদাকে তার মনে নেই, তার খুব ছোটবেলায়ই তিনি মারা গিয়েছিলেন। এমনকি বাবার মুখেও দাদার কথা খুব একটা শুনেছে বলে তার মনে পড়ে না। বাবার নিজেরই হয়তো অনেক কথা বলার ছিলো, কিংবা এমনও হতে পারে যে, দাদার সঙ্গে তাঁর আদর্শিক দ্বন্দ্ব ছিলো বলে নিজ পুত্রকে তিনি তাঁর কথা বলেন নি। কিন্তু শান্তার দাদার কাছে মোফাজ্জল আহমদ চৌধুরী এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, এবং অঞ্জনের ধারণা তিনি তাঁর আদর্শের সঙ্গেই অধিক নৈকট্য বোধ করেন। অবশ্য দাদার আদর্শটা যে ঠিক কি ছিলো অঞ্জনের কাছে এখনো তা পরিষ্কার হয়নি। শান্তার দাদার কাছে যতটুকু শোনা গেছে, তাতে মনে হয়, তিনি ছিলেন একইসঙ্গে বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং একরোখা। যুবক বয়সে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমিদারি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তিনি দুরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন – জমিদারির দিন শেষ হয়ে আসছে; অতএব পুরোপুরি শেষ হবার আগেই সেটা ছেড়ে দিয়ে তিনি দারুণ এক চমক সৃষ্টি করলেন, স্থানীয় মানুষের কাছে মহৎ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং আমৃত্যু সেই ইমেজ নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, প্রজাদের কাছ

থেকে খাজনা আদায় বন্ধ করে, নিজের জমিজমাগুলো আধাআধি ভাগে বর্গা দিয়ে তিনি বেশ উদারতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। এই উদারতা তিনি কোথায় পেয়েছিলেন কিংবা তখনকার প্রেক্ষাপটে এমন একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রেরণা তিনি কোথায় পেয়েছিলেন, বোঝা মুশকিল। বাংলাদেশের আর কোনো জমিদার – তা তিনি যত ক্ষুদ্র জমিদারই হোন না কেন – স্বেচ্ছায় জমিদারি ত্যাগ করেছিলেন বলে মনে হয় না, বরং তারা শেষ দিন পর্যন্ত তা আঁকড়ে থাকারই চেষ্টা করেছেন। সাম্যবাদী রাজনীতির সঙ্গে দাদার কোনো সংস্রব ছিলো বলে অঞ্জন কখনো শোনেনি, কিন্তু তিনি যে ধর্ম বিষয়ে একজন বড়ো মাপের পণ্ডিত ছিলেন, সে কথা সে অনেকের কাছেই শুনেছে। এমন হতে পারে যে, ধর্ম তার মধ্যে এক ধরনের ঔদার্যের জন্ম দিয়েছিলো। *তোমার সম্পদে প্রতিবেশির হক আছে* – ধর্ম কথিত এই ধরনের দর্শন হয়তো তাকে প্রভাবিত করে থাকবে। এসবই অঞ্জনের অনুমান, প্রকৃত বিষয়টি কি – সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেমন দেশভাগের প্রশ্নে অখণ্ড ভারতের পক্ষে এবং পাকিস্তান কনসেপ্টের বিপক্ষে তাঁর অবস্থান গ্রহণের কারণটি ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। সমস্ত পূর্ববাংলা যখন ফুঁসে উঠেছে পাকিস্তান আন্দোলনে, তখন তিনি ইসলামপ্রিয় মানুষ হয়েও ধর্মভিত্তিক জাতিভেদের বিরোধিতা করছেন – বিষয়টি খুব অদ্ভুত। *রাষ্ট্র ভেঙে গেলে জনগণের শক্তি ও সাহস কমে যায়* – তত্ত্ব কিংবা দর্শন হিসেবে এটা বেশ চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। যেখানে রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব নেই, সেখানে ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করে, সেটা ভাঙনের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, একই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-বিভেদ, ভুল বোঝাবুঝি ও বৈষম্যের অবসান কামনা করা – অন্তত তখনকার প্রেক্ষাপটে – তাঁর প্রগতিশীল অন্তর্লোকের পরিচয় দেয়। কিন্তু ওই দর্শন যে তাকে অন্ধ করে তুলেছিলো, মুক্তিযুদ্ধের সময় নীতিগতভাবে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনই তার প্রমাণ দেয়। পরিস্থিতি না বুঝে নিজ দর্শনের প্রতি অনড়-অন্ধ অনুরাগের জন্য প্রগতিশীল চিন্তার ধারকরাও যে কখনো কখনো ক্ষতিকর হয়ে ওঠেন – এটা তারও প্রমাণ। শান্তার দাদার কাছে এই ঘটনা শুনতে গিয়ে শান্তার মতোই অঞ্জনও একই প্রশ্ন করেছিলো যে, তিনি রাজাকার ছিলেন কী না। সে-ও যথারীতি একই উত্তর পেয়েছে। কিন্তু সে – দাদার নানারকম দুর্দান্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণ শুনেও – ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। এত যাঁর পাণ্ডিত্য তিনি কি বোঝেননি, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি একটি অবাস্তব কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে? শুধু ভৌগলিক সমস্যাই নয়, যে দেশের দুটো অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য এত প্রকট ও ব্যাপক – সে রাষ্ট্র যে টিকবে না, এটা কেন তিনি বুঝলেন না? আর এখানেই অঞ্জনের মূল জিজ্ঞাসা। অখণ্ড ভারতবর্ষকে যে দাদা রাষ্ট্র হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন, তার কারণটি কি? তিনি কি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা ভেবেছিলেন? মনে তো হয় না। সেক্ষেত্রে তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের বিষয়টি অনুভব করতে পারতেন। তাহলে ভারতবর্ষের কোন জিনিসটি তাঁকে এক একটি অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো? মুশকিল হলো, তিনি কোনো বিষয়েই কিছু লিখে যাননি – এত পাণ্ডিত্যের কোনো প্রমাণ তাই আর নেই – ফলে এসব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনাটা ঠিক জানা যাচ্ছে না। শান্তার দাদার ভাষ্য এবং মুগ্ধতা মাখা বিবরণ শুনে এসব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

অবশ্য এটা ছাড়াও অঞ্জন তার পূর্বপুরুষদের অনেককিছুই বুঝতে পারছে না। যেমন, তার প্রপিতামহ গোলাম আহম্মদ চৌধুরী কেন ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত খান বাহাদুর উপাধি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাও বোঝা যায় না। কেনই বা তাঁকে এই উপাধি দেয়া হয়েছিলো তাও স্পষ্ট নয়। এই উপাধি দেয়া ও প্রত্যাখান করা – এই দুটো ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গ্রাউন্ড ছিলো! উপাধি দেয়ার কারণটি না হয় ব্রিটিশদের ব্যাপার, কিন্তু তিনি সেটা প্রত্যাখান করলেন কেন? একদিকে ওদের অনুগ্রহে প্রাপ্ত জমিদারি করছেন, ওদের অনুগ্রহ ছাড়া কেউ কখনো জমিদার হতে পেরেছে – এমন তো শোনা যায় না) অন্যদিকে তাদেরই দেয়া উপাধি নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন – এর মানেটা কি? তাছাড়া, তাদের নামের পেছনে চৌধুরী উপাধিটাও তো ব্রিটিশদেরই দেয়া, সেটা তো কেউ ফেলে দেয়নি। অঞ্জন তার সব পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে জানে না, জানার উপায়ও নেই – কারণ কোথাও এ ব্যাপারে কিছু লেখা নেই। কিন্তু তার ধারণা – তাঁদের মধ্যে চমক দেয়ার একটা প্রবণতা ছিলো। গোলাম আহম্মদ চৌধুরী খান বাহাদুর উপাধি গ্রহণ না করে, মোফাজ্জল আহম্মদ চৌধুরী জমিদারি ত্যাগ করে, এবং অবশেষে তার বাবা হায়দার আহম্মদ চৌধুরী সরকারী ব্যাঙার সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিতভাবেই কাছের মানুষদের ভড়কে দিতে পেরেছিলেন এবং আমৃত্যু তাঁদের চেনা মানুষদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের চারপাশে গড়ে উঠেছিলো রহস্যের বেড়াজাল। সেই তুলনায় আমি নিতান্তই ছাপোষা সাধারণ মানুষ – অঞ্জন ভাবে – সেরকম কোনো চমক দেয়ার ক্ষমতাই আমার নেই।

অবশ্য তাদের এসব কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র চমক দেয়ার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত – এরকম ভাবনাটা খুব নেতিবাচক হয়ে যায়। তারা তাদের মতো করে কিছু একটা ত্যাগ করেছিলেন – সেই ত্যাগ তখনকার প্রেক্ষাপটে খুব সামান্য ছিলো না – এবং এ থেকে তাঁরা বিশেষ কোনো সুবিধাও গ্রহণ করেননি কারো কাছ থেকে – এই কথাটি মনে রাখা দরকার। দাদা ছিলেন তার মতবাদের পক্ষে অবিচল ও আপোসহীন। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি মেনে নিতে পারেননি বলে অভিমানভরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে – তবু স্রোতে গা ভাসাননি। (যদিও অখণ্ড ভারতে তিনি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতা ছিলেন এবং তার পরিচিতি ছিলো দেশজোড়া, সেটাকে তিনি ব্যবহার করে অনেক কিছুই করতে পারতেন।) আবার ওই একই দর্শনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেও তিনি রিস্কি পথেই গিয়েছিলেন। তাঁর ভাগ্য ভালো যে, যুদ্ধের পর তিনি বেশিদিন বাঁচেননি; বেঁচে থাকলে সমস্যা হতো – বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকেও তিনি নিজের দেশ বলে ভাবতে পারতেন না। ভদ্রলোকের জন্য অঞ্জনের কষ্ট হলো, খানিকটা করুণাও বোধ করলো – এত যার রাষ্ট্র নিয়ে ভাবনা, তার নিজের কোনো রাষ্ট্র ছিলো না। তাঁর সাধের অখণ্ড ভারতবর্ষের বাস্তবতা তো সেই চল্লিশের দশকেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো, তারপর বাকি জীবনটা তিনি যে দেশে দু টোতে কাটালেন তার কোনোটিকেই তিনি নিজের মনে করতে পারলেন না – এর চেয়ে করুণ ব্যাপার আর কি হতে পারে? আমার কোনো দেশ নেই – এই অনুভূতির চেয়ে মর্মান্তিক অনুভূতি আর হয় না – বিশেষ করে দেশ ব্যাপারটি যার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভদ্রলোক ছিলেন খাপ না খাওয়া মানুষ,

হয়তো এজন্যই জনগণের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার তোয়াক্কা না করে তিনি নিজের মতে অবিচল থেকেছেন, জনগণ যখন যেদিকে গেছে তিনি গেছেন তার উল্টোদিকে। এর ফলাফল হলো এই যে, আমৃত্যু তিনি রইলেন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে। নিঃসঙ্গ, একরোখা, আপোসহীন কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে এক ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবেই মারা গেলেন তিনি। এর কোনো অর্থ হয় না। পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পারাটা এক ধরনের অযোগ্যতা। অঞ্জনের মনে হয় – দাদা কোনোদিন জনগণের ইমোশনটাই বুঝতে পারেননি, কিংবা বুঝলেও সেটাকে ভুল বলে মনে করেছেন; ফলে এই সাধারণ সত্যটাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, ব্যাপক একটি জনগোষ্ঠী যদি কোনো ভুল ইমোশন নিয়েও মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী বিশাল ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে – তাহলে সেই ভুলটাও সুন্দর ও শ্বাশ্বত হয়ে ওঠে। সাত কোটি মানুষের আবেগের চেয়ে কোনো দর্শন বা তত্ত্বই বড়ো হয়ে উঠতে পারে না। দাদা যদি সব সময় জনগণের সঙ্গে থাকতেন, তাহলে কি হতো অঞ্জন তা জানে না – কিন্তু তাঁর জীবনটা এমন করুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো না।

অঞ্জন আজকাল তার পূর্বপুরুষদের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করছে। আমেরিকায় থাকার সময় সে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাই করেনি। দেশে ফিরে তার মধ্যে স্পষ্টতই পরিবর্তন এসেছে, আর এক্ষেত্রে শান্তার দাদারও একটা ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে তিনি যেমন মনে করেন – এই মানুষগুলো তাঁদের সময়ের থেকে তম মানুষ ছিলেন, চাইলে তাঁরা অনেককিছু করতে পারতেন; ব্যাপারটি তাকে ভাবতে শিখিয়েছে। চাইলে অনেক কিছু করতে পারতেন, তো চাননি কেন – এ-ও তার কাছে এক জটিল প্রশ্ন। তবে কি দাদা বা তাঁর বাবার মধ্যে খানিকটা বৈরাগ্য ছিলো – বৈষয়িক প্রাপ্তিগুলোকে কি তাঁরা গুরুত্বহীন মনে করতেন? এই একই প্রশ্ন বাবার সম্বন্ধেও করা চলে। বাবা যে তাঁর সম্মানজনক পেশা, উজ্জ্বল ক্যারিয়ার ও সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন – তার পেছনে কি খানিকটা বৈরাগ্য ছিলো – যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁরই পিতা ও পিতামহের কাছ থেকে?

৭

ছেলেমেয়েদের শেকড় চেনাবার জন্য সব ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়া – বাবার দেয়া এই তত্ত্বটি অঞ্জনের কাছে ইদানিং খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। এটা হয়তো একটি কারণ ছিলো, কিন্তু তা প্রধান নয়, অন্তত অঞ্জনের সেরকমই ধারণা। তার মনে হয়, এসব কথা বলে তিনি সবার সঙ্গে একটা আড়াল তৈরী করেছিলেন, আসল কারণ অন্য কিছু – কিন্তু সেই অন্য কিছুটা কি, সে তা বুঝে উঠতে পারছে না। এমনও তো হতে পারে যে, সেই কারণটি খুবই সাধারণ, যেমন – তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে খুব বড়ো ধরনের কোনো সমস্যায় পড়েছিলেন, সেটা কাটিয়ে উঠতে না পেরে রিজাইন করে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন এবং ব্যাপারটি সবার কাছে চেপে গিয়েছিলেন! এটা অবশ্য খুব নেতিবাচক ভাবনা হয়ে যায়, কিন্তু সম্ভাবনা থেকে এটাকে বাদ দেয়া যায় না। কিন্তু বাবার কোনো আচরণেই সে এই ভাবনার সমর্থন পেলো না। দ্বিতীয় আরেকটি কারণকেই তার কাছে

যথার্থ বলে মনে হলো। সেটা হচ্ছে – সম্ভবত এই নাগরিক জীবন এবং ধরাবাঁধা নিয়মবদ্ধ চাকরি তাঁর ভালো লাগেনি। যে উদাসপুরের আলো-হাওয়া-জল ও মাটিতে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, সবকিছুর চেয়ে তার টানটাই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিলো; আর এক্ষেত্রে তাঁর বৈষয়িক উদাসীনতা ও বৈরাগ্য তাঁকে সহায়তা করেছিলো। তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর স্মৃতির কাছে, শৈশব-কৈশোরের কাছে। গ্রামের সহজ সরল মানুষদের তিনি ভালোবাসতেন, তিনি ফিরেছিলেন তাঁর সেই স্বজনদের কাছে। তাছাড়া, কোনোকিছু ত্যাগ করার মতো মানসিক শক্তি তিনি হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়ে থাকবেন, ফলে পিতা ও পিতামহের মতোই তিনিও অবলীলায় ত্যাগ করতে পেরেছিলেন সরকারী কর্মকর্তার সম্মানজনক পদটি – এইভাবে অঞ্জন তার বাবা সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণায় ফিরে এলো। কিন্তু তারপরও তাঁর এই সিদ্ধান্ত এবং সন্তানদের শেকড় চেনাবার তত্ত্ব দাঁড় করানোটাকে সে খুব একটা যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে পারলো না। কোনো কিছু ছেড়ে দেবার অধিকার সকলেরই আছে। শুধু তাই নয়, একজন মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করবে সে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও সম্পূর্ণভাবে তারই। এক্ষেত্রে অন্য কারো হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। অঞ্জন মনে করে – এই বিষয়টি একজন মানুষের নিজস্ব পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত, যদিও সে জানে এদেশে ব্যাপারটিকে এভাবে দেখা হয় না, সমস্ত মা-বাবাই তাদের সন্তানদের জীবনপদ্ধতি বাতলে দিতে চান। হ্যাঁ, যদি কেউ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, যদি কেউ ইতস্তত করে যে, কোন জীপনপদ্ধতিটি তার বেছে নেয়া উচিত – তাহলে তাকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে; কিন্তু কেউ যদি সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকে, তাহলে তার ওপর ভিন্ন কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। এমনকি একজন মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে নিছক ইয়ার্কি করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে, কিংবা পথেঘাটে ঘুরেফিরে জীবনটাকে উপভোগ করবে, কিংবা কিছুই না করে স্রেফ চুপচাপ বসে থাকবে – তাকে সেই সুযোগ দেয়া উচিত। একজন মানুষ তো যাপনের জন্য একটিমাত্র জীবনই পায়, সেটাকে ইচ্ছেমতো কাটানোর সুযোগ সে কেন পাবে না? জীবন সম্বন্ধে অঞ্জনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তার বাবার সিদ্ধান্তের পক্ষেই যায়; কিন্তু ওই যে তত্ত্ব, গ্রামে নিয়ে সন্তানদের শেকড় চেনাতে হবে – এটার সপক্ষে তো কিছু দাঁড় করানো যাচ্ছে না। শেকড় চেনার জন্য কি উদাসপুরই একমাত্র স্থান? পুরো দেশই কি তাদের শেকড় হতে পারতো না? বাবা কেন এমন চিন্তা করেছিলেন বোঝা যায় না। তিনি কি একবারও ভাবেননি যে, তাঁর সন্তানরা যদি উদাসপুরকেই একমাত্র শেকড় হিসেবে চেনে, তাহলে এই দেশেরই অন্যান্য স্থানে তারা নিজেদেরকে নিজদেশে পরবাসী বলে ভাবতে পারে, যেমন এখন অঞ্জনের সেরকম অনুভূতি হয়! এই শহরকে তার অচেনা আর অনাত্মীয় মনে হয়; মনে হয় তার সবকিছু পড়ে আছে উদাসপুরে – উদাসপুর ছাড়া আর কোনোকিছুই তার আপন নয়! অথচ বাবা তাঁর শেষ জীবনে অঞ্জনকে যে দেশটি চেনাবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন – এই শহর তো সেই দেশেরই অংশ! দেশটিকে বুঝতে হলে শুধু উদাসপুরকে চিনলেই চলবে, এই শহরকে চেনার কোনো দরকার নেই – বিষয়টি কি এরকম? বাবা যদি এমনটি ভেবে থাকেন তাহলে, সন্দেহ নেই, তিনি ভুল করেছিলেন। একটি মাত্র গ্রাম বা একটি মাত্র শহরকে দিয়ে সমগ্র দেশকে কিছুতেই বোঝা যাবে না। সেই গ্রাম বা শহরে হয়তো দেশকে চেনা জানার অনেক উপাদান ছড়িয়ে থাকে কিন্তু তা কখনোই সম্পূর্ণ নয়! সম্পূর্ণ যে

নয় সেটা তো অহরহই বোঝা যাচ্ছে। উদাসপুরের মানুষের স্বভাব-চরিত্র-আচার-আচরণ এই শহরের মানুষদের স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। উদাসপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দু-দুটো নদী ওই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে। নদী-হাওর-বিল সংলগ্ন মানুষগুলো স্বভাবতই উদাসীন হয়, বিষয়বুদ্ধিহীন হয়। এ কথার সমর্থন মেলে বাউলদের জীবন দেখলে। কোনো শুষ্ক অঞ্চলে বা পাহাড়ী এলাকায় কখনো বাউল জন্ম নেয় না। সাধারণত এরা জন্ম নেয় পানিপ্রধান অঞ্চলে। এর কারণটি কি? নদী কি মানুষকে ঘর ছাড়া হবার ইন্ধন যোগায়? বিষয়বুদ্ধিহীন করে তোলে? মরমী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে? কিংবা ধরা যাক সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষদের কথাই। এদের চরিত্রের সঙ্গে কি অন্য অঞ্চলের মানুষের চরিত্রের কোনো মিল আছে? যাদেরকে অহরহ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, তাদের সঙ্গে কি শান্ত-সমাহিত-উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে বাস করা উদাসপুরের অধিবাসীদের তুলনা হয়? উপকূলের যে লোকটি জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড়ে তার একাধিক স্বজন হারিয়ে নিজে বেঁচে আছে, তার কাছে বেঁচে থাকাটাই তো একটা মিরাকল! সে যে বেঁচে আছে – এর চেয়ে বড়ো কোনো বিস্ময় তার কাছে আর নেই, অন্য কোনো বিস্ময়ই তাই তাকে অতটা আলোড়িত করবে না; আকস্মিকভাবে একই সঙ্গে সে অনেক স্বজন হারিয়েছে – অন্য কোনো মৃত্যুই তাকে অতটা স্পর্শ করবে না। তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নেই, বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো কোনো বিস্ময় নেই।

তো, এইসব বিভিন্ন ধরনের মানুষকে না চেনা গেলে কি আর দেশকে চেনা যায়? অঞ্জন আজকাল এগুলো ভাবে। এসবই তার চিন্তা, সত্যিকার অর্থে সে তো উপকূলবর্তী স্বজন হারানো কোনো মানুষ দেখেনি! সে আসলে দেখেনি কিছুই। উদাসপুর আর এই ঢাকা শহরের কিছু অংশ ছাড়া পুরো দেশটিই তার অদেখা রয়ে গেছে। মানুষ চেনা তো দূরের কথা, এদেশের প্রাকৃতিক রূপসৌন্দর্যও এখন পর্যন্ত তার কাছে কেবল ভ্রমণকাহিনী পড়ে রূপদর্শনের মতো – অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া। মানুষের কাছে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত আমেরিকার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, ইউরোপের কয়েকটি দেশও ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে তার – কেবল এই দেশটিরই কিছু দেখা হলো না।

এসব কথা ভাবলে বাবাকে একজন ব্যর্থ মানুষ বলেই মনে হয় অঞ্জনের। শেকড় চেনাতে ব্যগ্র ছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন ছেলেমেয়েরা দেশ নিয়ে মেতে উঠবে; শান্তার দাদা যেমন বিশ্বাস করেন – অঞ্জনদের পূর্বপুরুষদের সকলেই ছিলেন তাদের কালের শ্রে মানুষ এবং এই পরিবারেই জন্ম নেবে এমন একজন মানুষ যে দেশকে প্রোপারলি নেতৃত্ব দিতে পারবে – অতি কল্পনা, অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই – কিন্তু কে জানে, হয়তো বাবাও এমনটিই ভাবতেন। হয়তো তিনি তাঁর ছেলের মধ্যে সেই সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে চেয়েছিলেন আর এজন্যই তাঁর সারাজীবনের উপলব্ধি, দর্শন আর চিন্তাভাবনা জানিয়ে যেতে চেয়েছিলেন অঞ্জনকে। যদি বাবা সত্যি এমন কোনো স্বপ্ন দেখে থাকেন – তাহলে তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে, সে তো বলাই বাহুল্য। নেতৃত্ব দেয়া দূরে থাক, সে তো এই দেশের অংশই হয়ে উঠতে পারেনি। বাবার ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, তাঁকে দেখে যেতে হয়নি – তাঁর ছেলে জীবনের স্বর্ণালী সময়টুকু দিয়ে এসেছে অন্য একটি দেশকে।

বাবার চিন্তা বা স্বপ্নের প্রতিফলন আর কতটুকুই বা দেখা যাচ্ছে তাদের জীবনে? বোনদের দেখলে তো মনে হয়না যে, বাবার চিন্তা তাদের জীবনে কোনো কাজে এসেছে। সংসার নিয়ে মহাব্যস্ত এইসব চিরন্তন মহিলাদের কাছে শেকড় চেনার দাম কতটুকু?

অঞ্জন মাঝে মাঝে ভাবে – তার পূর্বপুরুষদের যেমন কিছু না কিছু ত্যাগের ইতিহাস আছে, সে-ও তেমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে না কি? এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিরাপদ জীবনের বৃন্ত ভেঙে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? কেমন হয় যদি সব ছেড়েছুড়ে সে সারাটি দেশ চষে বেড়ায়? বাবা উদাসপুর গিয়ে যে বৃক্ষের শেকড় গেড়েছিলেন, সে না হয় সারাটি দেশেই তার ডালপালা ছড়িয়ে দিলো! কিন্তু এ কথা মনে হলেই তার ঠোঁটে মৃদু ও দুঃখিত এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। বাবার কখনো খাওয়া-পড়ার কথা চিন্তা করতে হয়নি; উদাসপুরে উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন বিশাল সম্পত্তি – সে সবের ফসল থেকে সারাবছরের খরচ চলেও উদ্বৃত্ত থেকে যেত। অঞ্জনের আর সে সুযোগ নেই – সেই সব সম্পত্তি এখনো আছে কী না, নাকি দখল হয়ে গেছে, বা বোনরা বিক্রি-টিক্রি করে দিয়েছে, কিংবা থাকলেও কি অবস্থায় আছে, কার তত্ত্বাবধানে আছে – সে তার কিছুই জানে না। এখন আর সেগুলোর খোঁজখবর করাও সম্ভব নয়, কিংবা তার সেরকম ইচ্ছাই হয় না। দীর্ঘ প্রবাসজীবনের ফল সে পাচ্ছে হাতেনাতে। গ্রামের কথা সে যতই ভাবুক, যতই ভালোবাসুক সেইসব ফেলে আসা সোনালী দিনের স্মৃতি, যতই মগ্ন হয়ে থাকুক শৈশব-কৈশোর নিয়ে, কিংবা যতই মোহমুগ্ধ হয়ে থাকুক উদাসপুরে জল-হাওয়া-নদী ও আকাশ নিয়ে – সে জানে ওখানে গিয়ে আর বসবাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই শহর তার অচেনা, অনাত্মীয়, আর চেনা উদাসপুরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় – তাহলে সে করবেটা কি? এখানেও কি সে বাস করবে প্রবাসীর মতোই? নাকি অপেক্ষা করে থাকবে সময়ের সঙ্গে সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার? শান্তাকে সে এসব কথা বোঝায় কি করে? ও যখন ঘরে নিঝুম হয়ে বসে থাকা অঞ্জনকে বলে – বাইরে থেকে ঘুরে টুরে এসো না কেন? – তখন সে কি করে বলে – এই শহরটি আমার ভালো লাগেনা, আমি এখানকার কেউ নই!

৮

এতদিন পর দেশে ফিরে এসে এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অঞ্জনের যে অসুবিধা হচ্ছে শান্তা তা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে। বোঝা যায় এ-ও যে, এই সময়, এখানকার মানুষ আর এই দেশটিকে অঞ্জন প্রাণপণে চেনার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝেই অঞ্জন অফিস থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চলে যায়, কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, আর থাকবেই বা কি করে – ও তো মনে করে, এখানকার সবই তার অচেনা; সে তাই অনির্দিষ্ট ঘুরে বেড়ায় কিংবা ভিড়ে যায় বহু মানুষের কোনো জটলায়। তাদের আচার-আচরণ বোঝার চেষ্টা করে, আর বাসায় ফিরে মহা উত্তেজনা নিয়ে শান্তাকে সেই সব গল্প শোনায়। লোকটার চেষ্টা ও একাগ্রতা দেখে শান্তার খারাপই লাগে। এত আগ্রহ নিয়ে সে এই মানুষগুলোকে বুঝতে চাইছে, পারছে না শুধু

ওদের সঙ্গে তার দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার জন্য। অন্যদিকে দ্যাখো, যারা এই জীবন সহজেই বুঝতে পারত, তারা বেউ বুঝতেই চাইছে না। শান্তা জানে, এই শহরের মানুষ কী স্বার্থপর, নিজেদের নিয়ে কী ভয়ানক ব্যস্ত তারা, অন্যদের নিয়ে চিন্তার সময় কোথায়? হ্যাঁ, শান্তার মনে হয়, মানুষ আর তাদের জীবনকে বুঝতে হলে ব্যাপক সময় ব্যয় করা দরকার, যেমন করতো কায়সার – তার বন্ধু ও সহপাঠী, অসম্ভব মেধাবী আর সম্ভাবনাময় এক তরুণ, সকল বৈষয়িক অর্জনকে অস্বীকার করে যে শুধু লেখক হতে চেয়েছে। কায়সারই শান্তাকে শিখিয়েছিলো – কীভাবে তাকাতে হয় জীবনের দিকে, দেখিয়েছিলো – মানুষের জীবন কী ভয়াবহভাবে রাজনীতি-প্রভাবিত। আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ঘটনাও কীভাবে রাজনীতির সঙ্গেই সম্পর্কিত, কায়সার তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতো। শুধু তাই নয়, জীবনের যাবতীয় অনুষঙ্গই ছিলো তার আগ্রহের বিষয়, ফলে সব কিছু নিয়েই তার অদ্ভুত কিছু ভাবনা ছিলো। শান্তা সেই সব কথাবার্তা মাঝে মাঝে অঞ্জনের কাছে বললে ও এত অবাক হয়ে যায় যে বলার নয়। দু-একবার ও খুব সরলভাবে – তুমি বুঝলে কি করে শান্তামণি? – জিজ্ঞেস করলে শান্তা কায়সারের গল্প করেছিলো। সেই থেকে কায়সারের সঙ্গে কথা বলার খুব শখ অঞ্জনের। কিন্তু হচ্ছে-হবে করেও ওর সঙ্গে যোগাযোগটা আর হয়ে উঠছে না। ওর সঙ্গে অঞ্জনের আলাপ করিয়ে দিতে পারলে ভালোই হতো, অঞ্জনের হয়তো উপকারও হতো খুব। সেটা হয়ে উঠছে না বলে আপাতত শান্তা নিজেই অঞ্জনকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। শুধু কথা বলাই নয়, অঞ্জন না চাইলেও শান্তা মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে জোরজুলুম করে বাইরে বেরোয়। শুক্র-শনি দু-দিন ছুটিতে অঞ্জন যেন খানিকটা হাঁপিয়েই ওঠে। একটানা কতক্ষণ আর ঘরে বসে থাকতে ভালোলাগে? শান্তা তাই বেরোবার জন্য শনিবারটিকেই বেছে নেয়। সকালে নাস্তাটাস্তা সেরেই বলে, চলো বাইরে থেকে ঘুরে আসি। প্রথম দিকে অঞ্জন একটু ভয়ই পেতো – শান্তা যদি মার্কেট-টার্কেটে ঘুরতে চায়, তাহলেই হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিরক্তিকর জায়গা এইসব মার্কেট, তবু যে ওখানে যেতে মেয়েরা কেন এত ভালোবাসে! কিন্তু শান্তার ওদিকে খুব একটা টান নেই দেখে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অঞ্জনকে নিয়ে শান্তা প্রথমেই গিয়েছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। এখানে সে পড়াশোনা করেছে, এখানে তার অনেক স্মৃতি, এ নিয়ে গর্বও খুব। অঞ্জন খুব অবাক হয়েছিলো – ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতো একটা নটোরিয়াস ইউনিভার্সিটিতে পড়ে শান্তা এত গর্ব বোধ করে কেন? অঞ্জন তো যতদূর জানে – এখানে গোলাগুলি, মারপিট, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস – এসব লেগেই আছে। চার বছরের কোর্স শেষ করে বেরুতে বেরুতে একজন ছাত্রের ৭/৮ বছর লেগে যায়। তো, এই অবস্থায় এখানকার ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছে কিভাবে, আর করলেও তা নিয়ে গর্ব করার কী আছে – অঞ্জন ভেবে পেতো না। সে নিজে একটি পৃথিবী-সেরা ইউনিভার্সিটির ছাত্র – কই তার তো এ নিয়ে কোনো গর্ববোধ নেই! তাহলে কি এটা শান্তার একধরনের ক্ষুদ্রতা, যে, সে অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি দেখেনি বলে এটা নিয়েই তার যাবতীয় আবেগ, উৎসাহ, গৌরব? কিন্তু অঞ্জনের এই ধারণা বদলাতে সময় লাগেনি। শান্তাই বদলে দিয়েছে। ও তাকে বারবার এখানে নিয়ে আসে, এসে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, আর ওকে যেন কথায় পেয়ে বসে। বাসায় যেমন অঞ্জন প্রায় একাই উদাসপুরে গল্প করে যায় – এখানে এলে তেমনি শান্তা একাই তার ভার্সিটি জীবনের

গল্প করে। ওর যে গৌরব বা ইমোশন তার কারণ অঞ্জন এখন বোঝে। অঞ্জনের কাছে উদাসপুরের স্মৃতি যেমন সবচেয়ে প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ – শান্তার কাছে ভার্সিটি জীবন তেমনই – এখানেই সে রেখে গেছে তার সোনালী সময়, অনেক স্মৃতি ও সম্পর্ক, যে স্মৃতি ও সম্পর্কের জন্য অঞ্জন বরাবর তৃষ্ণার্ত বোধ করে। শান্তা অনেক গল্প করে। তাদের তারুণ্য ছিলো অস্থিরতায় ভরা। ইউনিভার্সিটির ভাবমূর্তি খুবই করুণ হয়ে পড়েছিলো ওই সময় – সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলবাজি আর হত্যা এ সবই হয়ে পড়েছিলো নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। যদিও এসবের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলো তারা সংখ্যায় খুবই নগন্য, মোট ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এদের সংখ্যা ২৮০-ও হবে কীনা সন্দেহ; তারা সবাই আবার ইউনিভার্সিটির ছাত্রও নয় – তবু এদের অপকর্মের দায়ভার বহন করতে হয়েছে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই। মাসের পর মাস ইউনিভার্সিটি বন্ধ থেকেছে, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রকম্পিত হয়েছে এই সবুজ মায়াময় ক্যাম্পাস, আর চলেছে ক্রমাগত অপপ্রচার। মিডিয়াগুলো সবসময়ই অতিরঞ্জিত করে খবর প্রকাশ করেছে, দুই পক্ষের মধ্যে ১০/১২ রাউন্ড গুলি বিনিময় হলেই পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে শত শত রাউন্ডের কথা। ছিনতাই হচ্ছে সারা শহর জুড়েই, অথচ ক্যাম্পাসে ওরকম একটা ঘটনা ঘটলেই সেটাকে এমন রঙচঙ মেখে পরিবেশন করা হতো – যেন এই ব্যাপারটি এখানে নিত্যদিনই ঘটে চলেছে। মানুষের এমন একটি ধারণা জন্মেছিলো যে, ক্যাম্পাস মানেই একটি বিভীষিকা, ওখানে কোনো মানুষের পক্ষে ঢোকা সম্ভব নয়। অথচ একবারও কেউ ভেবে দেখেনি – এখানে তাহলে সারাদেশের ২৮ হাজার ছেলেমেয়ে কীভাবে পড়াশোনা করছে, জানতে চায়নি ক্যাম্পাস সম্বন্ধে তাদের ভাবনাটা কি! এই ছেলেমেয়েদের কাছে ক্যাম্পাস তো মায়ের আঁচলের মতো মায়াময় ও নির্ভরযোগ্য, সবুজ ও প্রাণবন্ত। দেশে তো বটেই, বহির্বিশ্বে পর্যন্ত এসব প্রচারণার ফলে সবারই ধারণা জন্মেছে যে, এখানে পড়াশোনা বলতে কিছু হয় না, শিক্ষকরা রাজনীতিতে আর ছাত্ররা সন্ত্রাসে ব্যস্ত। কেউ ভেতরের খবরটি নেয়নি। জানতে চায়নি যে, তাহলে এখানে কীভাবে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে, পাশ করছে, কর্মজীবনে রাখছে মেধা ও সাফল্যের সাক্ষর। এই দেশের এমন কি কোনো সেক্টর আছে যেখানে এই ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা কাজ করছে না? এমন কি পাশ করার পর যারা উচ্চশিক্ষার্থে বাইরে যাচ্ছে, তারাও কি সেখানে উজ্জ্বল মেধার সাক্ষর রাখছে না? শান্তার অন্তত ১৫/১৬ জন বন্ধু-বান্ধবী এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করছে, এবং সবাই ওইসব ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্রে পরিণত হয়েছে। কোনোরকম ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কি এটা সম্ভব? এসব নিয়ে শান্তার ক্ষোভ আছে, দুঃখ আছে, আছে গভীর কষ্টবোধ। অঞ্জন এ কয়েকদিনে বুঝে গেছে – এসব ক্ষোভ, দুঃখ, কষ্টের পেছনে আছে এই ইউনিভার্সিটির জন্য ওর গভীর ভালোবাসা। যে মেয়ে ক্যাম্পাসকে মায়ের আঁচলের মতো নির্ভরযোগ্য আর মায়াময় বলে মনে করে, তার ভালোবাসার কথা কি আর বলে দিতে হয়? এতটা আপন করে ভেবেছে বলেই ওর কাছে এই ভার্সিটির মুল্যও অপরিসীম – পথিবী-সেরা ভার্সিটিতে পড়েও অঞ্জনের মধ্যে যা নেই।

প্রায় একযুগের প্রবাসজীবনে তারও যে কোনো স্মৃতি বা সম্পর্ক নেই তা তো নয়, কিন্তু সেগুলোর জন্য সে তেমন কোনো আবেগ অনুভব করে না। শান্তা যেমন করে। শান্তা ওর ফেলে আসা জীবনের অনেক গল্পই করেছে – তার দু একটি একেবারে আমুল নাড়া দিয়ে যাবার মতো। যেমন ও একদিন ওর কয়েকজন সহপাঠীর গল্প

করেছিলো, যারা মূলত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আর্মড ব্যাডার ছিলো, এবং মেয়েরা স্বভাবতই ওদেরকে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু যখন দল বেঁধে কোথাও যাওয়ার প্রোগ্রাম হতো, তখন ওরাই ছিলো ভরসা, কারণ সহপাঠীদের – বিশেষ করে মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ওরা সবসময় প্রস্তুত হয়ে থাকতো। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১ বৈশাখ বা ১৬ ডিসেম্বরের মতো বিশেষ দিনগুলোতে – যখন সারা শহর মানুষে মানুষে সয়লাব হয়ে যায়, তখন ওরা এমনভাবে মেয়েদের ঘিরে রাখতো যেন অন্য কোনো মানুষের ছোঁয়া পর্যন্ত না লাগতে পারে। সহপাঠীনিদের নিরাপত্তা দেখতে গিয়ে ওদের আর আনন্দ করা হতো না, কিন্তু এতে ওদের তেমন কোনো দুঃখও ছিলো না, কোনো না কোনো ভাবে যে ওরা বান্ধবীদের কাজে লাগছে – এতেই ওরা মহা আনন্দিত। এসব ঘটনায় শান্তা ও তার বান্ধবীরা অভিভূত হয়ে পড়তো। ছেলেবন্ধুদের মনে যে তাদের জন্য এত মমতা আছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য এত উৎকণ্ঠা আছে; এমন কি ক্যাডার বলে যাদেরকে তারা এড়িয়ে চলে, তারাও যে বান্ধবীদের জন্য এতটা সচেতন – এসব ঘটনা না ঘটলে তারা তা বুঝতেই পারতো না।

এই ব্যাপারটিকে অঞ্জন নিজের মতো করে বুঝে নিতে চেয়েছে। শান্তা ও বান্ধবীদের জন্য এটা ছিলো একটা উপলব্ধির ব্যাপার যে, তাদের বন্ধুরা তাদের ব্যাপারে কতটা সচেতন ও সংবেদনশীল। একসঙ্গে অনেকদিন পড়াশোনা করলে সহপাঠীদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের সখ্যতা গড়ে ওঠে। অঞ্জনেরও তা ছিলো, কিন্তু এ ধরনের কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটেনি। ওখানে মেয়েরা স্বাধীন, এমন কি যারা ভিন্ন দেশ থেকে এসেছে – তারাও। নিজেরটা নিজেকেই বুঝে নিতে হয় সবাইকে – তা ছাড়া উপায় নেই। কে কারটা দেখে? সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বিশেষ করে তার মতো প্রবাসীরা আমেরিকায় পড়তে আসাটাকে একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবেই দেখে, ফলে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সকলেই খুব উদগ্রীব। তাছাড়া, স্কলারশিপ বা টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ না পেলে খরচ চালানোর জন্য ওখানে প্রায় সবাই অবসর সময়ে নানা ধরনের কাজ করে। ফলে অফুরন্ত আড্ডার সময় নেই, সুযোগ নেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার। ছেলেমেয়েরা স্বাধীন বলেই, গার্জিয়ানদের ভূমিকা প্রায় নেই বলেই – একসঙ্গে সিনেমা দেখা বা কোথাও বেড়াতে যাওয়া তাদের কাছে রোমাঞ্চকর কিছু ছিলো না। এমনকি সামার বা ক্রিস্টমাস ছুটির সময়ও হয়তো তারা কোথাও দলবেঁধে ঘুরতে যেতো, কিন্তু সেটাকেও নিছক সময় কাটানো ছাড়া এমন বিশেষ কিছু মনে হয়নি অঞ্জনের। অথচ শান্তারা একবার সবাই মিলে কক্সবাজার গিয়েছিলো – এই ঘটনাটি নাকি তাদের জীবনে অন্যতম প্রধান ঘটনা হয়ে আছে। শান্তার মুখে সেই ভ্রমণ কাহিনীর নানা প্রসঙ্গ যে কতবার শোনা হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

মাস্টার্সের শেষদিকে, শিক্ষাসফরের নামে আমরা এক সপ্তাহের জন্য ঢাকা ছেড়েছিলাম। ৪০ জন ছেলে, ১০ জন মেয়ে। সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে, ডিপার্টমেন্টের ফান্ড থেকে অনুদান নিয়ে, জার্নাল বের করে সেখান থেকে বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া টাকা একসঙ্গে করে আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম। ব্যাপারটা শুনতে যতটা স্বাভাবিক শোনায়, আসলে ততটা স্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মা-বাবারা অতটা উদার এখনো হয়ে

যাননি যে, তাদের মেয়েকে এতগুলো ছেলের সঙ্গে সাতদিনের জন্য ছেড়ে দেবেন। কিন্তু বন্ধুদের প্রতি আমাদের প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস দেখে তারা সম্মতি দিয়েছিলেন। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার দিন সব মেয়েরই মা বাবা এসেছিলেন তাদেরকে বিদায় জানাতে, ছেলেদেরকে বলেছিলেন – তোমরা কিন্তু ওদের দিকে খেয়াল রেখো – ওদেরকে কখনো একা কোথাও যেতে দিইনি, এই প্রথম ওরা যাচ্ছে; তোমাদের ওপর ভরসা করেই যেতে দিচ্ছি। ছেলেরা খেয়াল রেখেছিলো – বেশ ভালোভাবেই রেখেছিলো।

আমরা একটা বড় বাস রিজার্ভ করে নিয়েছিলাম। তো, বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিলো সবার মধ্যে – এতগুলো বন্ধু একসঙ্গে, এতদিনের জন্য, ভাবাই যায় না। একেবারে স্বাধীন সবাই – এমনকি দৈনন্দিন চিন্তা থেকেও মুক্ত। তো, বাস যখন ঢাকা ছাড়লো তখনই আমাদের উদ্যোগি বন্ধুদের দু-জন – কায়সার ও রতন – হুমুল করতালি, হৈ হল্লোড় আর উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রারম্ভ ঘোষনা করলো। ছেলেরা যে খেয়াল রেখেছিলো সেটা বোঝা গেলো দু-তিন ঘণ্টা পর, যখন পথে একবার যাত্রাবিরতি করা হলো। ওরা এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলো – তোরা কি বেন্ড বাথরুমে যাবি? – আমরা তো লজ্জায় লাল, এরকম প্রসঙ্গ – এতদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করলেও কখনো ওঠেনি, বিষয়টি গোপনীয় বলেই। কিন্তু ওরা সহজ স্বাভাবিক, বললো – তোরা এত লজ্জা পাচ্ছিস কেন? এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সত্যিই অনেকের বাথরুমে যাওয়া দরকার ছিলো, কিন্তু বেন্ড মুখ ফুটে বলতে পারছিলো না। দু-তিন দিনের মধ্যে অবশ্য ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক হয়ে গেলো; দেখা গেলো এবার আমরা নিজেরাই বাস থামাতে বলছি বাথরুম পেয়েছে বলে। ছেলেরা অবশ্য ঠাট্টা করতে ছাড়লো না – দু-দিন আগেও তো পেট ফুলে মরে গেলেও অবলাদের মুখে কথা ফুটতো না, এখন নিজে থেকেই ...

আমরাও ছাড়লাম না, বিষয়টি নিয়ে মধুর একটা ঝগড়াই হয়ে গেলো, বললাম – তোরা তো একটি বিশেষ প্রাণীর মতো যেখানে সেখানে পা মুলে দাঁড়িয়ে যেতে পারিস, আমরা তো আর ওরকম নই, আমাদের মধ্যে লজ্জাশরম নামক একটা মানবিক গুণ আছে।

তা তোদের ওরকম হতে না করছে কে? তোরাও না হয় পা মুলে দাঁড়িয়ে যা, আমরা একটু দেখি।

অ্যাই, অসভ্যতা করবি না, ঠ্যাং ভেঙে দেবো।

অবলাদের মুখে আজকাল সন্ন্যাসীদের মতো হুমকিও বেরোয় দেখছি – লক্ষণ তো সুবিধার না। বলি, আমরা না হয় যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাই লজ্জাশরম নেই বলে – তা আপনারা যখন ব্যাপারটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন তখন আপনাদের লজ্জা যায় কোথায়? – ইত্যাদি ইত্যাদি।

তো, সাতদিনের প্রোগ্রামে দু-দিন যাবে পথে, দু-দিন কক্সবাজার, দু-দিন চট্টগ্রাম আর একদিন রাঙামাটি – এই ছিলো ভ্রমণসুচি। কিন্তু দেখা গেলো, কক্সবাজারে দু-দিন থাকলে পুর্ণিমাটা মিস করতে হয়, আর একদিন বেশি থাকলেই সেটা ধরা যায়। আমরা বায়না ধরলাম – পুর্ণিমাটা না দেখে আমরা কক্সবাজার থেকে যাবো না, তোরা রুটিন চেঞ্জ কর। বোঝা গেলো – ওদেরও সেরকমই ইচ্ছা, কক্সবাজার সবারই ভালো লাগছে। ওখানে আমরা ছিলাম পর্যটন সি বিচ থেকে ৩/৪ কিলোমিটার দুরে – আনবিক শক্তি কমিশনের রেস্ট

হাউজে। সেখানে পর্যটন বিচের মতো হৈ হল্লা নেই, মানুষের ভিড় নেই, সন্ধ্যার পর পরই সবকিছু নিঝুম নির্জন হয়ে যায়। রাতে খাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে ঘুরে বেড়াই, তারপর বাসে করে শহরে গিয়ে খেয়েদেয়ে এসে রেস্টহাউজে ঢুকি। রেস্টহাউজে তিনটে বেডরুম, একটা ড্রয়িং আর একটা হলরুম। তিনটে বেডরুমের দুটোই আমাদের – মানে মেয়েদের – জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য দুটো রুমে চারটে মাত্র বেড – কিন্তু তাতে কি? দুটো খাট জোড়া লাগিয়ে ভাগাভাগি করে সবাই মিলে শুতে কোনো অসুবিধাই হলো না আমাদের। কিন্তু ছেলেদের অবস্থা করুণ। একটা মাত্র বেডরুমে না হয় ৪/৫ জন শুতে পারে – বাকি সবাই? ড্রইং বা হলরুমে শোয়ার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তাতেও কোনো অসুবিধা হলো না। মানে, ওরাই সব ব্যবস্থা করে নিলো। বেন্ড সোফায়, বেন্ড ফ্লোরে গাদাগাদি করে রাত কাবার করে দিলো। অবশ্য ওখানে ঘুম হতো সামান্যই। কারণ, প্রায় সারা রাতই চলে ম্যারাথন আড্ডা। ছেলেরা অনেক রাত পর্যন্ত সৈকতে ঘুরে বেড়ায়, পাহাড়ে উঠে যায়, কিন্তু মেয়েদের জন্য এসব নিষেধ। অচেনা জায়গা – কখন কি হয়ে যায় বলা তো যায় না! আমরা টিপ্পনি কাটি – তোদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে নয়, আংকেলদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। কিন্তু ওরা নির্বিকার মুখে সেইসব বিষমাখানো টিপ্পনি শুনেই যায় আর ভাঙা রেকর্ডের মতো বলতেই থাকে – যা-ই বলিস, অচেনা জায়গা, কখন কি হয়ে যায় বলা তো যায়না, খামোখা তো একটা রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। অতএব আমাদেরকে হতাশ হয়ে ব্যালকনিতে বসেই জোসনাপ্লাবিত সমুদ্রের রূপ দর্শন করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অবশ্য খেয়ে ফেরার পর প্রতিদিনই হলরুমে আসর জমে; ওরা কোনো না কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেই ফেলে – গান, গল্প, কবিতা, কৌতুক, হাসি ঠাট্টা – এসবে দু-তিন ঘন্টা সময় অবলীলায় কেটে যায়। তারপর আমাদের ওপর হুকুম জারি হয় – এবার ঘুমোতে যা, সকাল দশটার আগে তো রাজকন্যাদের ঘুমই ভাঙতে চায় না। ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়বি, আর সকালে উঠে যেন নাস্তাটা রেডি পাই, নইলে .... ইত্যাদি। আমাদের এইসব বলে ওরা হাঁটতে বেরোয়।

ঐ নির্জন সমুদ্র সৈকত জোসনাপ্লাবিত হওয়ার জন্য পুর্ণিমার প্রয়োজন নেই, তার কয়েকদিন আগে থেকেই মনে হয় যেন জোসনার ঢল নেমেছে। তবু পুর্ণিমা তো একটা বিশেষ ঘটনা – বিশেষ করে সমুদ্র আর পুর্ণিমার কম্বিনেশন ক'-জন মানুষের দেখার সৌভাগ্য হয়? অতএব ওইদিন বিকেল থেকেই আমরা দাবি জানাতে লাগলাম – আজকে সারা রাত আমরা বিচে কাটাবো, তোদের কথা কিছুতেই শুনবো না। কিন্তু ওরা এবারও নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো – পাগল হয়েছিস! এতগুলো ডানাকাটা পরী রাতভর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই খবর পেয়ে যদি সন্ন্যাসীরা চলে আসে, তাহলে তো আমাদের লেজ গুলে পালানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না! আর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে তার দায়দায়িত্ব কে নেবে শুনি? – কিন্তু এসব বলে আমাদের আর নিরস্ত্র করা যাবে না। সবাই মিলে বসে সেরকমই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব আমাদের দাবি চলতেই থাকলো, আর রেস্টুরেন্টে বসে ছাড়লাম মোক্ষম অস্ত্র। বললাম – তোরা সব ভীতু, কাপুরুষ। চল্লিশটা কাপুরুষের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। এতগুলো জোয়ান-মর্দ মিলে যদি আমাদের নিরাপত্তা না-ই দিতে পারবি, তাহলে নিয়ে এলি কেন? – কিন্তু তারপরও ওরা নির্বিকার নিস্পৃহ। শুধু একজন টিপ্পনি কেটে বললো

– জোয়ান মর্দরা যেন কাজটাই বা জোয়ান মর্দদের মতো করছে বল? এই এতগুলো ডানাকাটা পরী পাশে নিয়েও কেমন সুবোধ বালক সেজে বসে আছে দেখেছিস না! আমাদের হৈ হল্লায় ওর কথা চাপা পড়ে গেলো ঠিকই, কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। এই জোসনাপ্লাবিত রাত কাটাতে হবে ঘরে বসে, সমুদ্রের এত কাছে এসেও! উহ্! আমরা যেন আর ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু বাস – প্রতিদিনই এসে রেস্ট হাউজের কাছে থামে – আজকে গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে সমুদ্রের কাছে। আমরা অবাক । আর আমাদের বিস্ময়কে আরো বাড়িয়ে দিয়ে কায়সার ঘোষনা করলো – আজকে তোদের স্বাধীনতা দিলাম। যা, যার যা ইচ্ছে কর।

মানে?

মানে আজকে আর ঘরে ফেরা নয়, সবাই মিলে বিচেই থাকবো, রাজি?

আমরা রীতিমতো স্তব্ধ হয়ে গেলাম – এই সিদ্ধান্ত ওরা আবার কখন নিলো? তারপরই একটা হল্লোড় উঠলো আনন্দের, আর তারপরই শংকার ফিসফিস – এই বলছিস যে, যদি সত্যিই কোনো বিপদ হয়?

ওরা এবার টিপ্পনি কাটতে ছাড়লো না – এহ, বীর নারীরা দেখি ভয় পেয়েছেন! এতক্ষণ ভরে যে আমাদের গালাগালি করা হলো, বলি এখন আপনাদের সাহস গেলো কোথায়?

এই ফাজলামি করিস না। বল না, যদি আবার বিপদ টিপদ হয়, তাহলে? তার চেয়ে বরং চল ফিরেই যাই।

আরে না। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি না?

ব্যবস্থা? ব্যবস্থা মানে?

মানে জানা গেলো, ওদের কয়েকজন আজকে থানায় গিয়ে জানিয়ে এসেছে; তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে ওরা স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছে – রাতে মেয়েরা বেরুলে কোনো বিপদ-টিপদের সম্ভাবনা আছে কী না! তারা আশ্বাস দিয়েছে। কোনো ঝামেলা হলে তাদেরকে ডাকতে বলেছে। এগুলো ওরা করেছে আমাদের তরফ থেকে দাবি ওঠার আগেই, কিন্তু সারপ্রাইজ দেবে বলে লুকিয়ে রেখেছিলো। শুনে আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম, বাস থেকে নেমেই কয়েকজন গেলো স্থানীয় জেলেপাড়ায়, লোকজনকে ডেকে বললো – আমরা কিন্তু সারারাত বাইরে থাকবো।

আচ্ছা বাবারা থাকেন, কোনো অসুবিধা নাই, আমরা খেয়াল রাখবো।

সেই রাত। অমন একটি রাত আমাদের কারো জীবনেই আর একটিবারও আসবে না। পুর্ণিমার থৈ থৈ জোসনায় ভেসে যাওয়া সমুদ্র সৈকত, উদার-উদাসীন-রহস্যময় সমুদ্র আর আকাশ আমাদেরকে একেবারে ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছিলো। সারা রাত আমরা ঘুরে বেড়ালাম; কখনো দল বেঁধে, কখনো গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে; কখনো গান গেয়ে, গল্প করে, কখনো চুপচাপ। বিষণ্ন উদাসীনতায় ছেয়ে গেলো সমস্ত প্রকৃতি যখন আমাদের লেখক বন্ধু – কায়সার – একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলো, আর শিল্পী বান্ধবী – সুরভী – গান গেয়ে শোনালো একের পর এক। আমাদের তখন মনে হচ্ছিলো – পৃথিবীতে আর কিছুই সত্যি নয়, একমাত্র এই বিশাল-উদাসীন-বিষণ্ন-গম্ভীর সমুদ্র আর আকাশ ছাড়া। নিজেদেরকে মনে হচ্ছিলো প্রকৃতিরই সন্তান। ঢাকায় ফিরে আমাদেরকে আবার সেই চার দেয়াল ঘেরা বদ্ধ ঘরে আটকা পড়তে

হবে, দু-দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বসতে হবে, আর তারপর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভিন্ন কোনো এক জীবন, এই এত কাছের বন্ধুরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, দূরে সরে যাবে জীবনের অনিবার্য নিয়মে – আমাদের তা মনেই ছিলো না। কতো কথা হলো আমাদের, কত গান, কত আবেগময় মুহূর্ত। শেষ রাতের দিকে কথা বলতে বলতে মিতা তো কেঁদেই ফেললো, বললো – এর আগেও আমি মা বাবার সঙ্গে এখানে এসেছি, হয়তো ভবিষ্যতে আবারও আসা হবে – একা অথবা স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু কোনোদিন কেউ আমাকে এমন করে স্বাধীনতা দেয়নি, দেবে না। আমাদের জীবনে আরো অনেক পূর্ণিমার রাত আসবে, কিন্তু এমন আর একটি রাতও আসবে না। আজকে তোদের কাছ থেকে যা পেলাম – কোনোদিন তা পাবো না কোথাও, বড়ো কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো রে সারা জীবন। ওর কথা শুনে, কান্না দেখে, আমাদেরও – মানে মেয়েদের – চোখ ভিজে উঠলো, ও যেন আমাদের সবার মনের কথাটিই বলে দিলো; আর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো ছেলেরা। ওরা সম্ভবত আমাদের কাছ থেকে এমন আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। গোল হয়ে বসে ছিলাম আমরা, ভোরের উদাসীন শীতল বাতাসে হঠাৎই যেন সবাই বড়ো বেশি চুপচাপ হয়ে গেলো। তারপর হঠাৎই কায়সার আবার আবৃত্তি শুরু করলো – *আমি তোমাদেরই লোক*; এটা শেষ হলে আরেকটা – *আজ সন্তুষ্টির পাশে বিদায়ের বিষণ্ন রুমালে কে তোলে অক্ষর কালো আসবো না* – ওর আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই সুরভী শুরু করলো গান – *আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে, ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে*। একসময় দেখা গেলো সবার চোখই ভেজা, সবার মুখেই অদ্ভুত বিষণ্নতা, যেন কোনো এক অলৌকিক যাদুর কাঠিতে ৫০ জন তরুণ-তরুণীর অনুভূতির জগৎ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। যেন কেউ আর আলাদা নয়, সবার ঠিক একই রকম অনুভব, একই আনন্দ, একই কষ্ট। ঐ সাতদিনে আমরা এক অপরকে এমনভাবে চিনেছিলাম, এত কাছাকাছি চলে এসেছিলাম যে, এর আগে ছয় বছরেও সেটা হয়নি। যেদিন ঢাকায় ফিরলাম, বাস এসে থামলো ক্যাম্পাসে; তার একটু আগে থেকেই বিদায়ের সুর বাজছে, ওরা দল বেঁধে গাইছে – *কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই* – গান তো গাইছে না, যেন কাঁদছে ওরা। বাস থামতে দেখা গেলো – সত্যি সবাই কাঁদছে। এবার আর নীরবে নয়, বরং প্রকাশ্যেই – একে অপরকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে, যেন ওই দিনই শেষ দেখা হচ্ছে। আসলে এমন নিবিড় করে পরস্পরকে অনুভব করার সুযোগ তো হয়নি কখনো, যদিও একসঙ্গে পড়েছি ছ-বছর – তবু এই শহরের জটিলতায় আক্রান্ত আমরা বুঝতেই পারিনি – আমাদের বন্ধুরা প্রকৃতপক্ষে কেমন, আর আমরা কতটা ভালোবাসি পরস্পরকে। সেই সুযোগ এনে দিয়েছিলো এই ভ্রমণ। তাই এমন কান্না, এত কষ্ট।

শান্তার এই গল্প শুনে অঞ্জন খুব ঈর্ষা বোধ করেছিলো। তার জীবনে এমন কোনো মধুর স্মৃতি নেই। তার যা কিছু ঐ উদাসপুর ঘিরে। সেখানে মা বাবা বোনেরা – কিন্তু বন্ধু তার ভাগ্যে জোটেনি। অন্তত এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তো সে কল্পনাই করতে পারে না। একটি মাত্র গানে সবাই কেঁদে উঠবে, একটি কবিতার পংক্তি সবাইকে বিষণ্ন

করে দেবে – এমন গভীর বন্ধুত্ব, এমন গভীর অনুভূতি পরস্পরের জন্য – সে ভাবতেই পারে না। এমন সম্পর্কের কোনো তুলনা হয় না। অচেনা কয়েকটি ছেলেমেয়ে হঠাৎ করে পরস্পরের এত কাছে এসে পড়ে ঐ বন্ধুত্ব নামক অদ্ভুত সম্পর্কের জন্য – অঞ্জন ওরকম একটি সম্পর্কের জন্য বড়ো তৃষ্ণার্ত বোধ করে। নেই, এই শহরে একজন বন্ধুও নেই তার, যার সঙ্গে কিছুটা স্মৃতি ভাগাভাগি করে নেয়া যায়।

৯

অঞ্জনের উপায় নেই, তাকে তাই একা একা ঘরে বসে থাকতেই হয়। যদিও সে কখনো কখনো অফিস থেকে বেরিয়ে, বাসায় না ফিরে জনারণ্যে মিশে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটি ঠিক হয়ে ওঠে না – এই মানুষগুলোকে তার অচেনা লাগে – এদের আবেগ, অনুভূতি, জীবনযাপনের ধরন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ কিছুই যেন তার চেনা নয়। আর এই শহর – অদ্ভুত আর প্রায় অসম্ভব অস্তিত্ব নিয়ে চেপে বসে তার বুকের ওপর। এটা কোনো শহর হলো? কোনো পরিকল্পনা নেই, কোনো সুদূর-সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই কারো মধ্যে এই শহর নিয়ে। যে যার ইচ্ছে মতো ব্যবহার করছে একে। কেউই ঢাকাকে ভালোবাসে না – ঢাকা যেন এক বেশ্যা, যাকে কেবল ব্যবহার করা চলে। সারাদেশ থেকে এখানে আসা মানুষগুলো হচ্ছে এর খদ্দের, আর এখানে যারা জমিটমির মালিক, তারা হলো পতিতালয়ের মাসিদের মতো – ওই পুঁজিটুকুর সর্বোচ্চ ব্যবহার করেই ছাড়বে। আর তাই, বিশাল বিশাল সব অট্টালিকা বিরামহীন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে – পাশাপাশি দুটো অট্টালিকার মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা ছাড়াই, কারণ, কেউ এতটুকু ছাড় দিতে রাজি নয়। এভাবে চলতে থাকলে একদিন এই শহরের মানুষগুলো নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ পাবে না, হাসফাস করতে করতে মরে যাবে। সে ভেবে পায়না, একটি দেশের রাজধানী শহরে এরকম অপরিকল্পিত কার্যকলাপ চলে কিভাবে? একের পর এক অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে – কিন্তু এর বাসিন্দাদের জন্য পানি-গ্যাস-বিদ্যুত ইত্যাদি নাগরিক সুবিধাদির ব্যবস্থা কি করা হচ্ছে? এ রকম একেকটা বিল্ডিং-এ যতগুলো মানুষ বাস করে – তাদের ময়লা ফেলার জন্য আলাদা করে একটা ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা দরকার, তা কি করা হচ্ছে? না, হচ্ছে না, তাই তো রাস্তাঘাটে নোংরা আবর্জনার ছড়াছড়ি – পুরো শহরটাই যেন এক ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। সুয়ারেজ ব্যবস্থাও তো মনে হয় ভেঙে পড়েছে, মানুষ বাড়ছে – তাদের মলমূত্র ত্যাগ করা তো আর থেমে নেই, সেগুলো প্রোপারলি পাস করার ব্যবস্থা না করেই এইসব অট্টালিকা নির্মাণের অনুমতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিভাবে দেয়? শুধু কি তাই? মানুষ বাড়ছে, যানবাহন বাড়ছে – রাস্তাঘাট তো আর বাড়ছে না, বাড়াবার জায়গা-ই বা কোথায়? চারদিকে কেবল অ্যাপার্টমেন্ট আর মার্কেট। ফল যা হবার তাই হয়েছে – রাস্তায় দুঃসহ যানজট। আচ্ছা, এত যে অ্যাপার্টমেন্ট আর মার্কেট গড়ে উঠেছে, ফ্ল্যাটগুলো দেদারসে বিক্রি হচ্ছে, মার্কেটগুলোও বেশ সরগরম থাকে প্রায় সারাবছরই – মানুষ এত টাকা পেলো কোথায়? এত ফ্ল্যাট বিক্রি হয় কিভাবে? এতগুলো মার্কেট চলে কিভাবে? অঞ্জন ঘুরতে ঘুরতে এদিকে ওদিকে চলে যায়, একবার দেখলো মগবাজার মোড় থেকে

মালিবাগ মোড় পর্যন্ত আধা কিলোমিটারের মধ্যে আটটা মার্কেট – আরো দু-একটা হচ্ছে। সে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। এটা কোনো পশ এলাকা নয়, নিতান্তই মধ্যবিত্তদের বসবাস এখানে, এতগুলো মার্কেট তাহলে চলে কিভাবে? শহর জুড়েই এই একই চিত্র। মার্কেট আর মার্কেট। তার হিসেব মেলে না কিছুতেই। এই শহরের চরিত্র সে বুঝতে পারে না। এ কি এক চরিত্রহীন শহরে পরিণত হলো? আবার দ্যাখো, একদিকে অট্টালিকা, সোডিয়াম বাতি, মার্কেট আর আরেকদিকে ফুটপাতে ছিন্নমূল মানুষের ভিড়, সেখানেই তাদের ধুলোর সংসার। এগুলো কি কারো চোখে পড়ে না? নাকি দেখে দেখে সয়ে গেছে? কেমন নির্বিকার, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত; নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই – যেন জীবনটা নিয়ে বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেছে তারা, কি থেকে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, এখানে সুখ নেই তো ওখানে চলো – ভেবে এখানে ওখানে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু সুখ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এ রকম হবার কথা ছিলো নাকি – এই যে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এই যে সুখ নামক অধরা জিনিসটির জন্য সবাই অন্ধ হয়ে দৌড়াচ্ছে – এমন কি হবার কথা ছিলো? আসলে কি যে হবার কথা ছিলো, আর কি যে ছিলো না, অঞ্জন তাই তো জানে না। এই দেশটির সম্ভাবনার কথা সে কখনো ভেবে দেখার সুযোগ পায়নি – দেশটা তো চেনাই হলো না তার। একটি দেশকে তখনই সম্ভাবনাময় বলা যায় যখন তার অধিবাসীদের মধ্যে থাকে অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। বাবার কথা মনে পড়লো অঞ্জনের। দেশের দুর্দশায় তিনি শেষ জীবনে বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন – বিশেষ করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বদলে মানুষের মধ্যে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার বিকার দেখে (হ্যাঁ, তিনি এটাকে বিকার -ই বলতেন) তিনি কষ্ট পেতেন খুব। কিন্তু তারপরও শেষ পর্যন্ত তিনি আশাবাদীই ছিলেন। এই আশাবাদের পেছনে খুব ভালো কোনো যুক্তি ছিলো না তাঁর, তবু তিনি স্বপ্ন দেখতেন – এই জাতি একদিন আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তিনি ইতিহাসের নিয়মের কথা বলতেন। বলতেন, একটি জাতি চিরকাল একইরকম ভাবে চলতে পারে না। হয় তাকে উঠে দাঁড়াতে হয়, নাহলে ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস কেবলই নিপীড়িত ও নির্যাতিত হবার ইতিহাস। কিন্তু এত পুরনো একটি জাতির জন্য যে আলাদা কোনো রাষ্ট্র ছিলোনা – এটাই ছিলো এই জাতির সম্ভাবনা ও বিকাশের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এই বাধাকে অপসারণ করেছে। বাবার মতে – ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপুর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপুর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। ঐ প্রথম বাঙালি কোনোরকম রাজনৈতিক দলের তৎপরতা ছাড়াই তীব্র ও স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলো। আর তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছে। এই জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে এর আগে এত গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা আর ঘটেনি। একটি রাষ্ট্রের জন্য, একটি মানবিক-শোষনমুক্ত-সাম্যের সমাজের জন্য একটি সমগ্র জাতির একসঙ্গে জেগে ওঠার মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় – বাবা তার স্মৃতি খুব আস্থাশীল ছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতা বরাবর ভুল মানুষের হাতে চলে যাওয়ার ফলে জাতি একটি সাময়িক দুর্দশায় পতিত হয়েছে – একথা ঠিক, কিন্তু এটা চিরস্থায়ী হতে পারে না; এই জাতিই একদিন নিজেদের মুক্তির জন্য জেগে উঠবে – এই বিশ্বাস নিয়েই বাবা চলে যেতে পেরেছেন, সেটা তার সৌভাগ্যই বলতে হবে – অঞ্জন ভাবলো।

সেই ছোটবেলায় অঞ্জন বোঝেনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারে বাবার মধ্যে ছিলো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন। আমার বলে কিছু থাকবে না, সবই আমাদের হয়ে যাবে এই চিন্তা তো আসলে সমাজতন্ত্রেরই চিন্তা। দাদা হয়তো অত পরিষ্কার ভাবে রাষ্ট্রকাঠামোর কথা ভাবতেন না, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়া পর্যন্ত ছিলো তাঁর স্বপ্নের সীমানা, কিন্তু বাবা আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রকাঠামোর কথা ভেবেছিলেন। সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতন শুরু হওয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন, এখনও যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে কি একই স্বপ্ন দেখতেন? কে জানে! আজকের এই অবস্থা দেখে বাবার ভাবনা ও স্বপ্নের সমর্থনে অঞ্জন কোনো উপাদানই খুঁজে পায় না। আচ্ছা, মানুষ না হয় না-ই ভাবলো সম্মিলিত আয়োজনের কথা – কিন্তু নিজের কথা ভেবেও তো সে একটু উদাসীন হতে পারে! মানুষ জানে না, উদাসীনতা তাকে কতটা সুন্দর করে তোলে! একটু উদাসীনতা, একটু গভীর বিষণ্নতা মানুষকে দার্শনিক করে তুলতে পারে। বিষয়-আশয়, সহায়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, প্রতিষ্ঠা-সাফল্য এসব নিয়ে এত ব্যস্ততা মানুষের, এত উৎকণ্ঠা, এত ভাবনা, এত হল্লোড়, এত প্রতিযোগিতা – যে, নিজের অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভাববার সময় তার একেবারেই নেই। কি হয়, এগুলো থেকে একটু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, একটুখানি উদাসীন হয়ে এই বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে? একটু বিষণ্ন হয়ে এই অসম্ভব সুন্দর বৃষ্টিপাত দেখলে? এই আকাশ ভেঙে পড়া জোসনায় গা ডুবিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারার জন্য কৃতজ্ঞতায়-বিস্ময়ে-বিপন্নতায় চোখ ভিজিয়ে তুললে? মানুষ জানে না, তার চারপাশেই আছে সুখ ও আনন্দ ও বিস্ময় ও রহস্যময়তার নানা উপকরণ ছড়ানো, একটু কেবল চোখ মেলে সেসব দেখে নিতে হয়। বিষয়-সম্পত্তি, সাফল্য ইত্যাদির উৎপাতে মানুষ এমনই অন্ধ হয়ে থাকে যে, ঐ চোখ মেলবার ফুরসৎ টুকু আর পায় না। কিংবা, হয়তো – হয়তো কেন, নিশ্চয়ই – কেউ কেউ আছে এমন, জীবন ও পৃথিবীর রহস্যময়তায় যে মুগ্ধ হয়ে আছে; কিন্তু তাদের সঙ্গে অঞ্জনের দেখা হয় না।

শান্তা যেমন ওর লেখক বন্ধু কায়সারের কথা বলে – তাদের সহপাঠীদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে মেধাবী ছিলো। এস এস সি, এইচ এস সি দু'টোতেই বোর্ড স্ট্যান্ড করা ছাত্র – বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বদলে গেলো। পড়াশোনায় তেমন মন নেই, কেবল ঘুরে বেড়ায়, আজ ঢাকা আছে তো কাল চট্টগ্রাম, পরশু বরিশাল কি কুষ্টিয়া – এই রকম। মাঝে মাঝে ক্লাস করতো বটে, তা-ও দায়সারা গোছের। অতিমাত্রায় মেধাবী বলে পরীক্ষার আগে আগে মাসখানেক পড়াশোনা করেই উতরে যেত। তাকে নিয়ে সবারই খুব কৌতূহল ছিলো। বন্ধু-বান্ধবীদের প্রশ্নের মুখে সে নাকি বলতো – আমি তো ক্যারিয়ারের কথা ভাবি না, জীবিকা একটা জুটেই যাবে – সেজন্যই তো পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে পাশ টাশ করছি। ওটা আমার কোনো লক্ষ্যই নয়। আমি কেবল সারাজীবন ধরে লিখে যেতে চাই। কয়েকটি ভালো গল্প, কয়েকটি উপন্যাস আর কিছু কবিতা। এই আমার একমাত্র চাওয়া, আর এজন্য ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার কোনো দরকারই নেই। শান্তা বলে – ও একটু চেষ্টা করলেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পজিশনটা পেতো, চেষ্টা না করেই – উদাসীন, বোহেমিয়ান জীবনযাপন করেও তো ও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলো। পজিশনটা পেলে নির্ঘাৎ ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে যেতে

পারতো – তা এসব নিয়ে যার মাথা ব্যথা নেই তাকে কে বোঝাবে? পাশ করে একটা দৈনিক পত্রিকায় চাকরি পেলো ও, তাই নিয়েই খুব সন্তুষ্ট আছে। খুব কম লেখে কায়সার, কিন্তু শান্তার দৃঢ় বিশ্বাস – কায়সার একদিন বড় লেখক হবেই। অঞ্জন অবশ্য ওর কোনো লেখা পড়েনি, ওর এখনো কোনো বই বেরোয়নি – তবে শান্তার বিচার-বিবেচনার ওপর তার শ্রদ্ধা আছে। বিয়ের পর শান্তা তাকে বাংলাদেশের কিছু লেখকের বই পড়িয়েছিলো – এই লেখকদের সঙ্গে তার তেমন পরিচয়ই ছিলো না, বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত-অখ্যাত অনেক লেখকদেরই সে মনোযোগ দিয়ে পড়েছে, কিন্তু এ দেশের লেখকদের পড়া হয়ে ওঠেনি – ওই বিদেশ-বিভুঁইয়ে তাঁদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই। কিন্তু শান্তার পছন্দের লেখকদের পড়তে গিয়ে তার মনে হয়েছে – এঁরা কোনো অংশেই বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের চেয়ে কম নন। তো, কায়সার বড় লেখক হবে কী না অঞ্জন তা জানে না; সেটা তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়ও; কিন্তু তার খুব ইচ্ছে হয় – একদিন গিয়ে কায়সারের সঙ্গে আলাপ করে আসতে। একটি মেধাবী ছেলে কী করে পারলো এমন অবলীলায় সব ছেড়ে দিতে, কোন বিষয়টি তাকে এমন উদাসীন-বিবাগী করে তুললো! খ্যাতি নয়, বৈষয়িক সাফল্য নয়, অর্থ সম্পদ নয়, সে কেবল চাইলো লিখে যেতে, কেবল ভালো কিছু সৃষ্টি করতে – কোথায় পেলো ও এই সৃষ্টির প্রেরণা?

অঞ্জন মাঝে মাঝে শান্তাকে বলে – তোমার বন্ধুদের আসতে বলো না কেন?

কিন্তু ওরা যে কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শান্তা নিজেও ঠিক জানে না। বান্ধবীদের বিয়ে হয়ে গেছে – ওদের সঙ্গে তবু যোগাযোগ আছে, কিন্তু বন্ধুরা যে কে কোথায়! পাশ করে অনেকেই বাইরে চলে গেছে, যারা দেশে ছিলো তারাও চাকরি বাকরি জুটিয়ে বেন্ড বা ঢাকা ছেড়েছে – বেন্ড ঢাকায়ই মহাব্যস্ত। ওই যে ক্যারিয়ার! জীবনে সাফল্য পেতে হবে, উঁচুতে উঠতে হবে । কত উঁচুতে? বেন্ড জানে না, তবু ওটাই লক্ষ্য।

তাহলে কায়সারকেই আসতে বলো না!

আচ্ছা বলবো। ও তো কারো বাসায় যায় না বলে শুনেছি, তবু বলে দেখবো।

অঞ্জনের ধারণা কায়সারের জন্য শান্তার একটা কোমল অনুভূতি আছে। সেটাকে কি প্রেম বলা যাবে? অঞ্জন একবার জিজ্ঞেস করেছিলো – তুমি কখনো প্রেমে পড়নি?

নাহ্।

কেন?

কেন আবার! প্রেমে পড়তেই হবে, এমন কোনো কথা আছে নাকি?

কিন্তু পড়াটাই তো স্বাভাবিক।

তা স্বাভাবিক, কিন্তু আমার সেটা হয়ে ওঠেনি।

কাউকে ভালোও লাগেনি?

তা লেগেছে হয়তো।

হয়তো? হয়তো কেন?

হ্যাঁ, লেগেছিলো।

লেগেছিলো? কাকে?

তা তোমাকে বলা যাবে না। তুমি এ নিয়ে আবার আমাকে ক্ষ্যাপাবে।

আহা বলোই না।

শান্তা স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, কিন্তু কথায় কথায় কায়সারের প্রসঙ্গই তুলেছিলো। অঞ্জনও ঢিল ছুঁড়তে ছাড়েনি –

তা কায়সারের সঙ্গেও তো তোমার প্রেম হতে পারতো!

না, পারতো না।

কেন?

প্রেমের জন্য অনেকগুলো শর্ত পুরণ করতে হয়, কিন্তু ও তো কোনো শর্ত পুরণ করার মানুষ নয়।

শর্ত? কিসের শর্ত?

আহা, তুমি যেন বোঝোনা কিছু।

হ্যাঁ, অঞ্জন বুঝেছিলো। শর্ত পুরণ করতে হবে। কি শর্ত? না, তোমাকে একটা ভালো চাকরি করতে হবে, তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত থাকতে হবে, সোসাইটিতে তোমার প্রোপার স্ট্যাটাস থাকতে হবে – যেন পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করা যায়, উঁচুতে ওঠার মানসিকতা ও চেষ্টা থাকতে হবে। লেখকদের কোনো ভবিষ্যত আছে নাকি? এই ক্যারিয়ার সচেতন যুগে লেখকরা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অপদার্থ, অযোগ্য – কারণ তারা স্বভাবতই উদাসীন। এদের ভালো লাগতে পারে – কিন্তু প্রেম? উঁহু, ওটা তার জন্য নয়, বিয়ে তো নয়ই। এদের সঙ্গে সংসার করা চলে না। পৃথিবীর সবারই আইডেন্টিটি আছে – রেঁধানি থেকে আমলা, সেপাই থেকে জেনারেল, ভিক্ষুক থেকে ব্যবসায়ী – কেবল নেই লেখকদের! লেখক – এটা কোনো আইডেন্টিটি হলো? আপনি কি করেন? লিখি। শুনেই তো ভ্রু কুঁচকে যায়। লেখা আবার কোনো কাজ হলো? অতএব, কায়সার তুমি ভালো লাগার মানুষ হয়ে থাকো, প্রেমিক হতে এসোনা, স্বামী তো নয়ই। আহ, বড্ড হিসেবি সবাই। জীবনে এতটুকু ছাড় দিতে রাজি নয় কেউ। এমনকি শান্তাও নয়।

তা শান্তার আর দোষ কি? সমাজটাই যে এমন, অন্যরকম কিছু ভাববার অবকাশ কোথায়?

নাহ, ভালো লাগছে না, এ শহরের কোনো কিছুই ভালো লাগছে না অঞ্জনের। এতসব সুরম্য অট্টালিকা গড়ে উঠেছে, অথচ তার মনে হচ্ছে – সবকিছু ভেঙে পড়ছে; যেন ফাঁপা একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে – ভেতরে সারবস্তু বলতে কিছু নেই। সবকিছুর ভেতরে সে ক্ষয়ে যাবার ছাপ দেখতে পাচ্ছে। আর এই ক্ষয়িষ্ণু শহরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে মানুষ – দেশের নানা প্রান্ত থেকে। জীবিকার সন্ধানে, বেঁচে থাকার উপায় খুঁজতে, সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের মোহে – আর পরিণত হচ্ছে একেকটি জড় পদার্থে। এদের চোখেমুখে কেবলই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানোর চিহ্ন, হতাশা ও দুশ্চিন্তার ছায়া; একজন মানুষ অন্যজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অঞ্জন সেটা ভালোভাবে টের পেয়েছিলো তার এক প্রতিবেশী মারা গেলে। সৌজন্যবশত সে গিয়েছিলো সেখানে, এবং অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিলো – সে ছাড়া আর কোনো প্রতিবেশীই আসেনি। আসা-যাওয়ার পথে যাদের

মুখ দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা চেনাই হয়ে গেছে – তাদের কাউকেই সে দেখতে পেলো না ওখানে। এমনিতেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে পারস্পারিক কোনো সম্পর্ক নেই। একই বিল্ডিং-এর দুটো তলার বা পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটের লোকজনের মধ্যে কোনো আলাপ পরিচয় নেই। কেউ কোনো কৌতূহলও দেখায় না প্রতিবেশী সম্বন্ধে। সম্ভবত তা ভদ্রতা বিরুদ্ধ ব্যাপার বলে মনে করা হয়। তাই বলে মৃতের বাড়িতেও কেউ আসবে না! অদ্ভুত! সে-ও গিয়ে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলো। কেউ কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আর সে নিজেকে প্রতিবেশী হিসেবে পরিচয় দিলে তারা যেন বেশ অবাকই হয়েছিলো। যেন, এমনটি তো হবার কথা নয়! আর কেউ আসেনি, উনি এলেন কেন? সত্যি, ভারি অদ্ভুত লেগেছিলো অঞ্জনের।

এখানে প্রত্যেকটি সামাজিক আয়োজন-অনুষ্ঠান হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো প্রতিবেশীদের বাদ দিয়ে, কেবল সংশ্লিষ্টদের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে। এই শহরে সম্ভবত প্রতিবেশী থাকতে নেই। অথচ উদাসপুরে প্রতিবেশীরা নিকটাত্মীয়ের মতোই আপনজন। একে অপরের সুখে দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, শোকে-উচ্ছ্বাসে-আয়োজনে বিনা আমন্ত্রণেই এগিয়ে আসে। বাবার কথা মনে পড়লো অঞ্জনের। ইদানিং তার মনে হচ্ছে, দেশকে চিনতে হলে গ্রামে যেতে হবে – বাবার এই উপলব্ধিটা সঠিক। ঢাকাকে দেখে নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে চেনা যাবে না! নিশ্চয়ই সারা দেশের চিত্র এই রকম নয়! ঢাকা তো ভুলভাবে গড়ে ওঠা শহর। সারাদেশ থেকে ছুটে আসছে মানুষ এই শহরে। তা, কি চাই এখানে? চাকরি, ব্যবসা, প্রতি া, সাফল্য। আর? আর উঠতে চাই উঁচুতে, অনেক উঁচুতে, এত উঁচুতে যেন সবাইকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে হয়, আঙুল তুলে বলতে হয় – ওই যে অমুক, দেখো কত ওপরে উঠেছে; যেন এইসব অপগণ্ড অপকৃষ্ট মুর্খ মানুষগুলোর ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা যায়। তা, অত ওপরে উঠতে গেলে তো তোমাকে ভালো মানুষের মত থাকলে চলবে না। তাহলে কি করতে হবে? তোমারই মতো যারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে চাচ্ছে – সময় সুযোগ বুঝে তাদের ল্যাং মারো। এখানে কেউ তোমার সহযোগী নয়, সবাই তোমার প্রতিযোগী – এই কথাটি মনে রেখে চলবে; এখানে কোনো ফেয়ার ডিলিংস-এর সুযোগ নেই, সবই ফাউল গেম। অতএব ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে প্রতিযোগী কমাও, পথও পরিষ্কার কর। মনটা যে কেমন কেমন করে! আরে দুর, এইসব মধ্যবিত্তসুলভ স্যাঁতস্যাঁতে আবেগ ছাড়ো – ল্যাং না মারলে পথ পরিষ্কার হবে কিভাবে? আর খবরদার, ল্যাং মেরে আবার পেছনে ফিরে দেখতে যেও না যে, লোকটার কি হলো – ঠ্যাং ভাঙলো, মাথা ফাটলো, নাকি মরেই গেলো! গেলে গেছে, অযোগ্য বলেই টিকে থাকতে পারেনি। অতএব তুমি মর্মপীড়া থেকে অবলীলায় মুক্ত থাকতে পারো। যোগ্যতার বলেই তুমি এগিয়ে যাচ্ছো, এগুতে গিয়ে একটু-আধটু ল্যাং মারতে হচ্ছে, কনুই মারতে হচ্ছে, ধাক্কা দিতে হচ্ছে; পেছন থেকে তোমার মধ্যবিত্ত মা-বাবা-শিক্ষক-বই-পুস্তক-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিখে আসা মূল্যবোধ নামক ফালতু জিনিসটা তোমাকে টেনে ধরার চেষ্টা করছে বলে ওদিকে না তাকিয়েই তোমাকে মাঝে মাঝে পিছ-লাথি মারতে হচ্ছে – তাতে আবার তোমারই ফেলে আসা স্বজনরা আঘাত পাচ্ছে। পাক, তুমি তো আর দেখছো না! এসবই করতে হয়, নইলে ওঠা যায় না। অতএব, গ্যালো – মূল্যবোধ গ্যালো, সহানুভূতি গ্যালো, শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি-আদর্শ সব গ্যালো। রইলো কেবল ওপরে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয়

কূটকৌশল। বেন্ড রইলো না আর আপনজন-স্বজন হয়ে, সহযোগী হয়ে – সবাই হয় প্রতিযোগী, না হয় এগিয়ে যাবার পথে বাধাবিপত্তি , যাদেরকে যে কোনো মূল্যে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। মানবিক সম্পর্কের চর্চা আর রইলো না। কিছুই রইলো না আসলে। মানুষ বন্দি হলো নিজেরই সৃষ্ট কারাগারে। যখন ফিরে তাকাবার ফুরসৎ পাওয়া গেলো, দেখলো – খামোখাই সে এত ওপরে উঠেছে – বেন্ড তো নেই চারপাশে, মা-বাবা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিজন-বন্ধু- শুভাকাঙ্ক্ষী বেন্ড নেই। সে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলো, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এই তো শহরে মানুষ। বেন্ড ও রকম ওপরে উঠে গেছে, বেন্ড উঠতে শুরু করেছে, বেন্ড উঠতে চাইছে – আর তার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে সে প্রস্তুত। চুরি-চামারি-লুটপাট-হত্যা-জখম-সন্ত্রাস সব। আর এই শহর কেবলই তাদের ডেকে বলছে – পেছনে ফিরে দেখো না; সততা, আদর্শ, সত্যবাদিতা, মূল্যবোধ এগুলো সব অকেজো আভিধানিক শব্দ, এসব ছাড়ো। ছেড়ে সবাই ছোট হয়ে যাও, খুব ছোট, তাতে নানারকম ফাঁকফোকর গলে সাফল্যের দুর্গম দুর্গে ঢুকে যেতে সুবিধে হবে তোমার। পারলে বামন মানব হয়ে যাও – আর সবাই তাই-ই হচ্ছে। বামন মানবে ভরে গেছে এই শহর। এমন ভুলভাবে গড়ে ওঠা শহরের ভবিষ্যত কি? না, এই ভুল শহরকে দিয়ে দেশকে চেনা যাবে না। যদিও সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে সব মহল থেকে। ঢাকা যেন দেশের প্রতিবিম্ব – এ কথাই বলতে চাইছে সবগুলো সরকার; অতএব দ্যাখো আমাদের কত উন্নতি হচ্ছে – এত অট্টালিকা, সুরম্য প্রাসাদ, পিচঢালা বিশাল সব রাজপথ, অলিগলিতে ব্যাংক-হাসপাতাল-স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি। আমরা কত উন্নতি করেছি, দ্যাখো। না, এই চিত্র সারাদেশের নয়। আর সেটা যদি হয়েই থাকে তাহলে তো এটাও মানতে হয় যে, সারাদেশে এই শহরের অন্যান্য অনুষঙ্গও ছড়িয়ে পড়েছে – দুর্নীতি, অসততা, সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিসর্বস্বতা – সব। না, তা হতে পারে না। বাবার কথা মনে হলো আবার – গ্রাম দ্যাখো, দেশকে চিনতে পারবে। অতএব গ্রামে যেতেই হবে।

১০

এতদিন হয়ে গেলো অঞ্জন দেশে ফিরেছে অথচ আজো উদাসপুর যাওয়া হলো না – এবারটু অস্বাভাবিক যেন বিষয়টি। যার মুখে সারাক্ষণ উদাসপুর, অথচ সেখানে যাওয়ার নাম করছে না – দুটো ব্যাপার মেলানো যায় না। প্রায়ই সে উদাসপুর যাওয়ার কথা ভাবে, কিন্তু যাওয়া আর হচ্ছে কোথায়? তবে কি সে-ও এই শহরের ঘেরাটোপে আটকা পড়ে গেলো? ঢাকাকে তার ভালো লাগছে না, এ আমার নিজের শহর – মনে করতে চাইলেও পারছে না কিছুতেই, মানিয়ে নিতে পারছে না এই শহরের বহমান ব্যস্তসমস্ত আত্মপর জনজীবনের সঙ্গে। প্রায়ই প্রবাস জীবনের সঙ্গে তুলনা এসে যাচ্ছে – সেখানেও তো পরিবেশটা এমনই ছিলো – বেন্ড কারো নয়, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অঞ্জনের পরিচিত গণ্ডি খুবই ছোট, সেখানে আবার কোনো হাস্য কৌতুক নেই, বৈষয়িক উদাসীনতা নেই, কিংবা নেই কোনো কিছু নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার চিহ্ন। সমগ্র জনজীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনাও ক্ষীণ, তাই সে এই শহরেরই আরেকটি রূপ চেনে

না। যে জীবনের জন্য তার তৃষ্ণা – সাফল্যের জন্য বিশ্বী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত কুটিল মানুষের জীবন ও জগৎ থেকে এবটুখানি হলেও মুখ ফিরিয়ে জীবনের বহুমাত্রিক আনন্দে শরিক হওয়া, এবটু আড্ডা, হাস্য কৌতুক, জোসনা বা বৃষ্টিতে ভেজার সুমুল আনন্দ – সেই জীবন তার ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন সবালে দৈনিক পত্রিকায় দেখা ও পড়া এই শহরের বীভৎস রূপ তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। সে যেন সব জায়গাতেই ধস দেখতে পাচ্ছে – রাজনীতি তো পচেই গেছে, সঙ্গে গেছে অর্থনীতি, সংস্কৃতি চর্চা – এসবও। নিজের শহর বলে ভাবতে চাইলেও সে কি করে এসব মেনে নেয়, মনে তো হয় এসবই অন্য কারো, তার নয়।
তবু তো এই শহর ছেড়ে যাওয়া হচ্ছেনা কোথাও। তার মাঝে মাঝে ভয় হয় – উদাসপুরের মানুষ এবং তাদের ভাষাও কি অচেনা হয়ে গেছে তার কাছে? সে কি ঠিক ঠিক চিনে নিতে পারবে উদাসপুরের মানুষের উচ্চারিত ও অনুক্ত শব্দাবলী – এই এতদিন পর!
অঞ্জনের খুব ভয় – নানারকম ভয়। উদাসপুর যদি সত্যিই অচেনা লাগে তার কাছে, যদি মনে হয় ঢাকার মতো উদাসপুরও তাকে গ্রহণ করছে না, যদি ওখানেও নিজেকে বহিরাগত বলে মনে হয়, তাহলে কি হবে? সে তখন দাঁড়াবে কোথায়? এতদিন ধরে সে উদাসপুরের স্মৃতি ও স্বপ্ন বুকে করে বেড়াচ্ছে – ওই গ্রাম তার কাছে মায়ের কোলের মতোই মমতাময়ী। পৃথিবীর আর কোথাও না হোক, উদাসপুর তাকে প্রশান্তির আশ্রয় দেবে, জীবনের শেষ মুহূর্তে হলেও সে ওখানে ফিরে যাবে, মরে যাবে উদাসপুরের আকাশ আর নদীর গভীর উদাসীনতার মধ্যে আর মানুষের মমতা ও ভালোবাসা পেয়ে, তারপর চিরকাল শুয়ে থাকবে মা-বাবা-দাদা-দাদুর পাশে – এই সব ভাবনা ও স্বপ্ন ও কল্পনা যদি ওলট পালোট হয়ে যায় – সে তো সারা জীবনের জন্য উদ্বাস্তু হয়ে যাবে! আর তাছাড়া শেষবারের মতো সে যখন উদাসপুর গিয়েছিলো, তখনও মা ছিলেন। এখন তিনি নেই, বাবা তো আগেই গেছেন – আপনজন বলতে দুর সম্পর্কের ওই ফুপু। নিশ্চয়ই বাড়ির চেহারা অনেক পাল্টে গেছে – সেই পাল্টে যাওয়া চেহারাই বা কতটুকু মেনে নেয়া যাবে? শান্তা যদিও খুব যাওয়ার কথা বলে অঞ্জন তবু সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। যাওয়াটা কি ঠিক হবে?
কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়েও থাকা গেলো না। যখন সব কিছুর চেয়ে, সব সময়ের জন্য উদাসপুরের স্মৃতিটাই বিশাল হয়ে ওঠে, তখন না গিয়ে আর উপায় কি? অফিসের জরুরী মিটিং চলার সময় উদাসপুরের মেঠো পথ চোখের সামনে ভেসে উঠলে, কিংবা রাতে শান্তার মধু বুকে ঠোঁট ডুবিয়ে বাড়ির পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যটি হাজির হলে, কিংবা কথা নেই বার্তা নেই উদাসপুরের নদী আকাশ মাঠ মেঠোপথ ধানক্ষেত বা সংখ্যাহীন মানুষের মুখ তার দৈনন্দিন নিরুপদ্রপ সময়গুলোকে তছনছ করে দিলে – শান্তার অব্যাহত উৎসাহও একটি কারণ বটে – সে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়, আর তাতে বোনরা নতুন করে চিন্তায় পড়ে। নতুন বউ নিয়ে যাচ্ছিস – ওখানে কে দেখবে? কিন্তু অঞ্জন এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে – বড় আপাকে ফুপুর কাছে শুধু চিঠি লিখেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

উদ্দাসপুর, মানিকগঞ্জ শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার ভেতরে। শান্তা দু চারবার শহরে – তার দাদা বাড়িতে – এলেও এত ভেতরে যায়নি কখনো। অঞ্জনের কাছে সংখ্যাহীন গল্প শুনে, তবু, উদ্দাসপুর তার কাছে এক অতিপরিচিত স্বপ্নের মতো – যাকে সে কোনো দিন বাস্তবে দেখেনি, অথচ খুব চেনা।

উদ্দাসপুর কীভাবে যাওয়া যায়, এ নিয়ে চিন্তা ছিলো – গত এক যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়েছে কী না, কে জানে? অঞ্জন তাই গাড়ি নিয়ে যাবার কথা চিন্তাই করেনি। শান্তাকে বলেছে – আগে যেভাবে যেতাম, সেভাবেই যাবো, রাজি? – শান্তা রাজি। তার কাছে যাওয়াটাই বড় কথা।

অতঃপর গাবতলী থেকে বাসে চড়ে, পথে গোটা বিশেক স্টপেজে থেমে, ক্লান্তিতে বিরক্তিতে ঘামে গরমে একাকার হয়ে দেড় ঘণ্টার পথ সাড়ে তিনঘণ্টায় পাড়ি দিয়ে তারা যেখানে এসে থামলো, শান্তা জায়গাটার নাম কয়বার সিনেমা পত্রিকায় পড়েছে – ঝিটকা। এমন আহামরি কিছু নয়, তবু সিনেমার লোকেরা কেন এটাকে লোকেশন হিসেবে বেছে নিয়েছে কে জানে ? কিন্তু এসব ভাবার সময় এখন নয়। বরং বহু দিন পর – যেন কয়েক যুগ বা কয়েক শতাব্দি পর – নিজ গ্রামের পথে ফিরে আসা অঞ্জনকে লক্ষ্য করা দরকার। সে যেন এই মুহূর্তে একটু দ্বিধান্বিত অথবা অন্যমনস্ক। বাস থেকে নেমে শান্তাকে নিয়ে অঞ্জন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সামনে বোধহয় একটা নদী। এই নদী নিয়েই যদি অঞ্জন এতটা মাতামাতি করে থাকে তাহলে, শান্তার আশাভঙ্গ হচ্ছে। কালিগঙ্গাও তো এর চেয়ে বড়। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অঞ্জন মৃদুস্বরে – আগে এখানে অনেক নৌকা ভিড়ে থাকতো, এখন এত কম, কাউকে তো চিনতেও পারছি না – বললে শান্তা বুঝতে পারে, অঞ্জন বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত। ফুপু কি কাউকে পাঠিয়েছেন কী না, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। না কি অন্য কোনো রুটে যাওয়া উচিত ছিলো? গাবতলী থেকে বালিরটেক বা হরিরামপুরের বাসও ছাড়তে দেখেছে অঞ্জন। আগে এ রকম কোনো রুট ছিলো না – এই একটিই ছিলো, তাই এটাই তার চেনা। আর তাছাড়া, সে জিজ্ঞেস করে জেনেছে – ওই বাসগুলো থামে পাটগ্রাম স্কুলের কাছে – ওখান থেকে বাড়ি প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার দূরে। যদি ওই পথটুকু হাঁটতে হয় তাহলে শান্তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এখন রিকশা টিকশা চলে কী না কে জানে, কিন্তু সে যখন এই স্কুলে পড়তো, বাড়ি থেকে প্রতিদিন হেঁটেই আসতে হতো। অন্য কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না। সে তাই ঝিটকা হয়ে নদীপথে বাড়ি যাওয়ার কথাই ভেবেছে। কিন্তু ঘাটে নৌকা মাত্র দু-তিনটে – আগে এখানে শ' খানেক নৌকা ভিড়ে থাকতো। চেনা কাউকে দেখাও যাচ্ছে না, সে তাই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ একটা ২০/২২ বছরের যুবক প্রায় দৌড়ে এসে অঞ্জনের পা ছুঁয়ে সালাম করলে তার অন্যমনস্কতা কেটে যায়।

ভাইজান আপনে? এদ্দিন পর! বাড়িত যাইবেন?

হ্যাঁ, হ। কিন্তু যাবো কিভাবে, মানে যামু কেমনে?

শান্তা ভীষন মজা পায়। অদ্ভুত তো! অঞ্জন একইসঙ্গে দু রকমভাবে বলছে।

আমার নাওয়ে আসেন।

তুমি নৌকা চালাও, নাও বাও নাকি?

হ, বাজানের কামডাই ধরছি।

অঞ্জন ভীষণ সমস্যায় পড়ে। এই ছেলেটিকে সে চিনতে পারছে না। কিন্তু যেভাবে বাজানের কথা এসে গেলো, তাতে মনে হচ্ছে – চেনাটা খুবই উচিত ছিলো। সে আর কোনো কথা না বলে ছেলেটির পিছু পিছু এবং শান্তার আগে আগে নৌকায় গিয়ে ওঠে। এবং উঠেও কোনো কথা না বললে ছেলেটি হঠাৎ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়,

ভাইজান মনে অয় আমারে চিনেন নাই।

অঞ্জন মৃদু হাসে।

আমি আইয়ুব আলি।

অঞ্জন দ্রুত স্মৃতি হাতড়ায়। আইয়ুব আলি। যার বাপের পেশা নৌকা চালানো। এবং অচিরেই মনে পড়ে, ছেলেটি জহির মোল্লার (লোকে যাকে ঝাইরা মুল্লা বলে ডাকতো) সন্তান। এতক্ষণে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তুই কত বড় হয়ে গেছিস, ডাঙ্গর অইছস রে আইয়ুব!

হ ভাইজান। কদ্দিন পর দেখতাছেন। ডাঙ্গর তো লাগবোই।

চাচা কেমুন আছেরে আইয়ুব? তোর মায়? হোসনা, রীনা, লিলি, নওয়াব আলি?

ভাইজানের দেহি সবতেরে মনে আছে। হোসনা রীনা লিলির বিয়া ওইয়া গেছে। নওয়াব আলির অসুখটা সারে নাই। বাজানও বিছনায় পড়া। অসুখ।

অঞ্জনের কি এবটু মন খারাপ লাগছে? সম্ভবত। জহির চাচা ছিলো তাদের বাঁধা মাঝি। যত কাজই থাকুক, খবর পেলে ঠিকঠাক হাজির হয়ে যেত। এক যুগ আগেও এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো জঘন্য – নৌকাই ছিলো একমাত্র বাহন। আব্বা বছরে ৪/৫ বার কখনও ঢাকার উদ্দেশ্যে, কখনও নানুবাড়ির উদ্দেশ্যে সবাইকে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসতেন। ঢাকায় যেতে হলে আসতে হতো ঝিটকায়, সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে বেউথা, তারপর কালিগঙ্গার পার হয়ে মানিকগঞ্জ শহর থেকে ঢাকার বাস। আবার ঝিটকা না এসে, বানিয়াজুড়ি পর্যন্ত নৌকায় গিয়ে, সেখান থেকেও বাসে ওঠা যেতো। বাবার পছন্দ ছিলো দ্বিতীয়টাই। সম্ভবত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ার ঝক্কি পছন্দ করতেন না বলে। অবশ্য অঞ্জনের ভারি ভালো লাগতো, অন্তত ঘোড়ার দৌড়ানোর শব্দ – টক টক টকর টকর --- এখনও যেন কানে বাজে। আবার নানু বাড়িতে যেতে হলে সরাসরি নারিশা, সেখান থেকে হেঁটে ওই বাড়িতে। নানুবাড়িতে যাওয়ার কথা অঞ্জনের খুব মনে পড়ে। এই নৌকা ভ্রমণ ছিলো উৎসবের মতো একটা ব্যাপার। ভোর বেলা নৌকায় উঠলে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যেতো, ঐ এক নৌকায় এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। যে ভ্রমণ খুব বিরক্তিকর হওয়ার কথা ছিলো – আব্বা, মা, জহির চাচা মিলে সেটাকেই খুব উপভোগ্য করে তুলতেন। মা বাড়ি থেকে ডাল ভাত রেঁধে নিয়ে যেতেন, কিন্তু তরকারি নিতেন না। জহির চাচাকে বলতেন – ভেঁসাল দেখলে থামাইও জহির। – অতঃপর জহির চাচা যেতে যেতে মাছ ধরতে থাকা জেলেদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়তো – কি মাছ? – গুড়া। – নাহ্ হলো না, আবার। আবার। ইলিশ মাছ পেলে কথাই ছিলো না। জহির চাচা নৌকার খোল থেকে মাটির আলগা চুলা, পাতিল, পেঁয়াজ, মরিচ, তেল ইত্যাদি বের করতো। মা নৌকায় বসেই রান্নার কাজে লেগে যেতেন। গন্ধে মৌ

মৌ করতো চারপাশ। মা'র রান্না টলটলে ঝোলের তাজা ইলিশের স্বাদ আজো যেন মুখে লেগে আছে – ওটার কোনো তুলনা আজ পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পায়নি অঞ্জন। রান্নার সময় জহির চাচা সুবিধা মতো জায়গায় নৌকা ভেড়াতো। তারা ভাইবোন মিলে ঝাঁপাঝাঁপি করে গোসল করতো, তারপর ঐ খাওয়া। আহ্, অমন খাবার আর কোথায় পাওয়া যাবে? খাওয়া শেষ হলে পান নিয়ে বসতেন মা আব্বা। বোনরা গিয়ে মাকে ধরতো – মা খোকাকে একটু পান খাওয়াই? – না জিহ্বা ভারি হয়ে যাবে। – একটু মা, একটু। – মা তখন একটু পান, একটু করে সুপারি, চুন আর খর মেখে দিতেন। অঞ্জন মুখে দিতে না দিতে রসে মুখ ভরে যেতো, পিক ফেলতে গিয়ে গড়িয়ে শার্টে পড়তো, তা ওসব অত খেয়াল করবে কে? বোনরা তখন তার লাল হয়ে যাওয়া ঠোঁট দেখায় মহাব্যস্ত – দেখি দেখি খোকাভাই তোর ঠোঁট দেখি – বললে আর অঞ্জন ই ই করে দাঁত দেখিয়ে দিলে বোনরা হেসেই কুটিপাটি – ও মা দ্যাখো দ্যাখো, ও আব্বা দ্যাখোই না আমাদের লাল ভাইয়ের ঠোঁট কত লাল হয়েছে। দ্যাখো না! – আহ্, সেই সব দিন। সেই দৃশ্যাবলী কোথাও যেন স্থির হয়ে ঝুলে আছে, কোনো ঝুশলী শিল্পীর আঁকা রিয়্যালিস্টিক ছবির মতো – নইলে অঞ্জন সবকিছু এত স্পষ্টভাবে দেখে কিভাবে? এত দিন আগের ঘটনা, এমন ভাবে তার চোখে ভাসে কেন, তার চোখ ভিজিয়ে তোলে কেন?

শান্তার স্পর্শ তাকে বর্তমানে ফেরায়। ওর চোখে প্রশ্ন। সম্ভবত আইয়ুব আলির সামনে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায় না বলে চুপ করে থাকে। অঞ্জন মৃদু হাসে, তারপর আইয়ুব আলির সঙ্গে গল্পে মাতে আবার।

কুনদিক দে যাবি রে আইয়ুব?

প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও এতক্ষণে উদাসপুরের ভাষায় ফিরে আসতে পেরেছে বলে স্বস্তি বোধ করে অঞ্জন।

পদ্মা দে যাই।

কেন, মুন্নার খাল দে গেলেই অয়।

পদ্মা দে গেলে কম আটতে অইবো। নাও তো বাড়ি পর্যন্ত যাইবো না। পদ্মার পাড়েই ভিড়ামু, বাড়ির কাছেই। মুন্নার খাল দে গেলে অনেকদুর নামতে অইবো।

পদ্মা দে গেলেও তো অনেক আটতে অইবো।

না ভাইজান, আপনে অনেক দিন আসেন নাই তো, তাই দেহেন নাই, পদ্মা ভাইঙ্গা অনেকদুর আইছে। কুম্যার পাড়া ধর ধর।

কস কি?

হ, ভাইজান। মানুষের দুঃখ চোহে দ্যাহন যায় না।

তয় যে শুনছিলাম বাধ দিয়া ভাঙন ফিরাইবো?

হেই কতা আর কইয়েন না ভাইজান। ভোট আইলে ঢাহা থে মন্ত্রী মিনিস্টার আইসা এই সব কতা শুনায়, ভোট গেলে গা আর এই দিকে পাও বাড়ায় না।

শান্তা এ সব কথাবার্তার খেই পায় না, কিন্তু অঞ্জনের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারে – পদ্মা ভাঙনের ব্যাপারটি খুব বিপর্যয়কর, নইলে সে এমন গম্ভীর হয়ে উঠবে কেন? কথা বলার সুযোগ খুঁজলেও শান্তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে

না এই সব আলোচনায় অংশগ্রহণ করা। অথচ এই নদী, এই ফুরফুরে হাওয়ার ভেতরে স্বপ্নের মতো এক যুবকের সঙ্গে নৌকায় চড়ে অচেনা গন্তব্যের দিকে চলার মতো দুরন্ত রোমান্টিকতা তাকে উপভোগ করতে হচ্ছে একা একা – অঞ্জনের সঙ্গে কথাবার্তা ছাড়াই। এ কি ভাবা যায়? এরা প্রায় অচেনা এক বিচিত্র ভাষায় – শান্তা নিজে মানিকগঞ্জের মেয়ে হলেও এই ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, দাদা বাড়িতে সে বরাবর এসেছে অতিথির মতো, বেড়াতে – কথা বলে যাচ্ছে তো বলেই যাচ্ছে। এই অবস্থা কতক্ষণ চলবে কে জানে? নাহ্, এরকম চলতে দেয়া যায় না। শান্তা তাই জিজ্ঞেস করেই ফেলে –

অ্যাই, এই নদীটার নাম কি?

অনেকক্ষণ পর অঞ্জন শান্তার দিকে নজর দেয়। মনে হয়, এই প্রথম বউ যাচ্ছে তার শ্বশুর বাড়িতে – সব কিছুর সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার।

এটা হচ্ছে ইছামতি, বুঝেছো! এই সোজাসুজি গেলে পদ্মায় পড়বো, তারপর কিছুদূর গেলে আবার ইছামতি।

বুঝলাম না, এক নদীর মধ্যে আরেক নদী!

হ্যাঁ, ইছামতি ভাগ হয়ে গেছে। আগে একটাই ছিলো। আমাদের বাড়ির কাছে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে তারপর পশ্চিমদিকে ইউ টার্ন নিয়ে আবার উত্তর-দক্ষিণে বয়ে যেতো। আমরা এখন সেই পরের অংশে আছি। পশ্চিমের ইউ টার্নিংটা পদ্মার সঙ্গে মিলে গেছে। পদ্মা ছিলো অনেক দূরে, ভেঙে ভেঙে এসে মিশেছে ইছামতির সঙ্গে, বুঝেছো?

শান্তার জন্য সময়টি নিশ্চয়ই খুব চমৎকৃত হবার, নইলে একটি নদীর গতিপথের এই সামান্য বর্ণনায় তার মনে হবে কেন – এই লোকের কি অজানা কিছুই নেই?

শান্তার মুগ্ধতা অঞ্জনকে ছুঁয়ে যেতে না যেতে একটু দূরে ইছামতির মুখ দেখা যায়, পদ্মার উত্তাল-উদ্দাম ঢেউ চোখে পড়ে। শান্তার বেতুহলী চোখ এখন বিস্ফারিত।

আমরা ওখান দিয়ে যাবো?

হ্যাঁ, ওটাই পদ্মা।

না না, তুমি ওকে না করো। ওখান দিয়ে আমি যেতে পারবো না।

আইয়ুব আলি দাঁত বেলিয়ে হাসে– কিছু অইবো না ভাবীসাব, এর চাইতে বড় বড় ঢেউতে ভাইজান কত সাতরাইছে, আপনে তো সেগুলান দেখেনই নাই।

শান্তা – তুমি সত্যি এরকম ঢেউতে সাঁতার কাটতে? আশ্চর্য! যদি ডুবে যেতে! – বলে মৃদু মিষ্টি কটাক্ষ করলে অঞ্জনের বুক জুড়ে পদ্মার ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যায়। আহ্, এই নদী! কত যে স্মৃতি, কত যে আনন্দ ও বেদনা এই নদীকে নিয়ে! যেন অন্তহীন এক গল্পের উৎস এই নদী। অথচ তার জীবন যে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলো এই নদীর সঙ্গে তা তো নয়! কেবল কয়েকটা বছর কাছাকাছি থাকা, প্রবল স্রোত আর ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, ঘন্টার পর ঘন্টা সাঁতার কেটে লাল টুকটুকে চোখ নিয়ে বাড়ি ফিরে মা র বকা খাওয়া, আর শীতের শান্ত পদ্মায় সূর্য ডুবে গেলে আবীর মাখানো এক অদ্ভুত উদাসীনতা গায়ে মাখিয়ে স্বপ্নবতর হয়ে ওঠা।

অথচ মনে হয়, অজস্র গল্প জড়িয়ে আছে এই নদীকে নিয়ে। অঞ্জন নির্নিমেষ তাকিয়ে যেন নিজের শৈশব কৈশোরকেই দেখতে পায়; – ওই তো নৌকায় করে তারা যাচ্ছে নানুবাড়িতে। বোনেরা জোর করে পান খাইয়ে তার লাল ঠোঁট দেখতে চাচ্ছে আর সে ই ই করে ছোট্ট দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছে, বোনরা চিৎকার করে – ও মা দ্যাখো আমাদের লাল ভাইয়ের ঠোঁটটাও কেমন লাল হয়েছে – বললে মা ও আব্বার মুখ স্নেহের হাসিতে সিক্ত হয়ে উঠছে। আহ্! সেই সব দিন। কোনোদিন ফিরবে না সেই সময়! সময় বড়ো নিষ্ঠুর নিয়তি, যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যায় সব – যা কিছু পায় হাতের কাছে, আর ফিরিয়ে দেয় না। কী ট্র্যাজিক এই মানব জীবন! যার গর্ভে আমার জন্ম, যার কোলে আমার বড় হয়ে ওঠা, যার হাত ধরে পৃথিবীর পথে নামা প্রথম বারের মতো – তাদেরকে মাটির নিচে রেখে এসে আমাকে জীবন যাপন করতে হয়। অঞ্জন হয়তো কাঁদছিলো, মনে মনে, কিংবা প্রকাশ্যেও দু-চার ফোঁটা অশ্রু ঝরে থাকবে হয়তো – শান্তার স্পর্শে তাই গভীর মমতা ঝরে পড়ে। সময়টি কথা বলার নয় – শান্তা বোঝে। অঞ্জনের চোখ ভেজা – নিশ্চয়ই মনে পড়ছে সব কিছু!

শান্তা কোনো কথা না বলে, লজ্জা উপেক্ষা করে অঞ্জনের কাঁধে মাথা রেখে বসে থাকে। এত ঢেউ! নৌকাটা ক্রমাগত ওঠানামা করছে, কী যে ভয়ের ব্যাপার! কিন্তু অঞ্জন বা আইয়ুব আলি বেপারি বিষয়টিকে পাত্তাই দিচ্ছে না। ভয়টা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হবার সুযোগ পায় না। অচিরেই আইয়ুব আলি নৌকা ভেড়ায়। এখানে ইছামতি শুকনো, ভরাট হয়ে গেছে নদী, এখন আর বর্ষা ছাড়া পানি থাকে না, ফলে নৌকা নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার উপায় নেই। নামতে হবে এখানেই। অঞ্জন এবার আগে শান্তাকে নামতে দিয়ে পরে নিজে নেমে পড়ে। এই তার উদাসপুর। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েও তার সাধ মেটে না। কিন্তু এত অচেনা লাগছে কেন সবকিছু? তার এত চেনা গ্রাম, ইছামতি, পদ্মার পাড়, আকাশ ও বৃক্ষসমূহ – সবকিছুতে কেন এমন অচেনার ধুলো পড়েছে? অঞ্জনের মন খারাপ হয়ে যায় – তবে কি উদাসপুর থেকেও অনেক দূরে সরে গেছি আমি? যে ভয়টা পাচ্ছিলাম, তা কি সত্যি হতে চলেছে? এই জন্মভূমিতেও কি নিজেকে বহিরাগত বলে মনে হবে আমার?

আইয়ুব আলি ব্যাগপত্র নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে অঞ্জন আর শান্তা তাকে অনুসরণ করে। অঞ্জনের কাছে পথটা এখন একটু পরিচিত লাগছে। কিন্তু পথের দুপাশে অসংখ্য বাড়িঘর – সে যখন গ্রাম ছেড়েছিলো, তখন এগুলো ছিলো না। অঞ্জন বুঝতে পারে – এরা সব পদ্মা ভাঙা পরিবার। ছোটবেলা থেকেই সে এসব দেখেশুনে আসছে। সর্বনাশা সর্বগ্রাসী পদ্মা প্রতিবছরই অসংখ্য বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে যায়। অসহায় নিরাশ্রয় মানুষগুলো সব হারিয়ে কোনোমতে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু করে নেয় অন্য কোনো গ্রামে। ওইটুকুই। বাড়ি-ঘর-জমি-জমা সব নদী গর্ভে, হয়তো হালের গরুটা বিক্রি করে মাথা গোঁজার জন্য এই জমিটুকু কিনেছে। মোটামুটি স্বচ্ছল একটি চাষী পরিবার এখন হয়তো ঠিক মতো খেতেই পায় না। বাড়ি নেই যে দু-চারটে ফলমূল বা তরিতরকারি ফলাবে, জমি নেই যে চাষ করবে। আর অসংখ্য পরিবার সব হারিয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে অন্য গ্রামে এসে চড়াও হয় বলে সেসব গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে; কাজের তুলনায় মানুষ বেশি বলে সক্ষম কর্মঠ নারী পুরুষরাও বেকার বসে থাকে। গ্রামের চেহারা বদলে যায় – দুঃসহ দারিদ্র, অসহায়ত্ব, আর কর্মহীনতায় ধুঁকতে থাকে সমস্ত অঞ্চল। এ এক অবর্ণনীয় ভয়াবহ অবস্থা। যারা এর শিকার

নয় তারা কল্পনাও করতে পারবে না অবস্থাটা। এ অঞ্চলের মন্ত্রী, এম.পি রা এটা উপলব্ধিই করতে পারে না, তাই সামান্য একটি বাঁধ দিয়ে স্রোতের মুখটা ফিরিয়ে দিয়ে এ এলাকার হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার সমাধান করার কথা তাদের মনেও থাকে না।

দাদার কথা মনে হলো অঞ্জনের। তাঁর স্মৃতি অবশ্য ধূসর – এসব ঘটনা সে লোকমুখে শুনেছে – বিশেষ করে শান্তার দাদার কাছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ দেশ জুড়েই এক ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরী করেছিলো। নিরাপত্তাহীনতার জন্যই হোক কিংবা – এই দেশ আমাদের নয় – এই চিন্তা থেকেই হোক, দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগ করছিলো। দাদা নাকি তখন এই অঞ্চলের হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভয় দিতেন – তোমরা যেও না, আমি তো আছি, আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের এতটুকু ক্ষতি হতে দেবো না। – দাদা ছিলেন প্রভাবশালী আর সবলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, তাঁর অভয়বাণী কাজে লেগেছিলো, ফলে এই অঞ্চলে হিন্দুদের দেশত্যাগের ঘটনা – অন্তত দাদা বেঁচে থাকতে – ঘটেনি বললেই চলে। ঐ সময় হিন্দুরা চলে গেলে তাদের বাড়িঘর দখল করে নেয়ার ধান্ধায় ছিলো যে সব লোক, তারা বিন্তু দাদার ওপর বেশ নাখোশই হয়েছিলো। দাদার কাছে নাকি কতিপয় লোক দাবিও নিয়ে এসেছিলো – হুজুর যারা যাইতে চায়, তাগো যাইতে দ্যান না! ওগো মনের মদ্যে খালি হিন্দুস্থান, তয় অরা ইন্ডিয়ায়ই যাক গা। দাদা বলেছিলেন – কোনো মানুষের ওপর এ রকম জুলুম তোমরা করো না। একজন মানুষ যখন তার দেশ ছেড়ে যায়, জন্মভূমি ছেড়ে যায় – সে কি কেবল এক টুকরো জমি বা একটি বাড়ি ছেড়ে যায়? একই সঙ্গে ছেড়ে যায় তার অনেক স্মৃতি, সম্পর্ক ও শেকড়। ইন্ডিয়ায় গিয়ে এই লোকগুলো হয়তো একটা বাড়ি পাবে, কিংবা জমি পাবে কিন্তু তাদের শেকড় যে এই গ্রামে। তাদের সমস্ত স্মৃতি ও সম্পর্ক যে এই মাটিতে। এগুলো তারা কোথায় পাবে? এ দেশ তো শুধু মুসলমানদের নয় – এটা ওদেরও দেশ। ওদেরকে নির্ভয়ে নিজের দেশে থাকতে দাও।

এই এখন অসংখ্য নদীভাঙা পরিবারের ছোট ছোট ঘরগুলো দেখে অঞ্জনের মনে হলো – এদের ক্ষেত্রেও কি দাদার কথাগুলো খাটে না? যে বাড়িতে এদের জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা, যে বাড়ির প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে এদের আজন্ম পরিচয় ও সখ্য – সেই বাড়ি ভেঙে নিয়ে গেছে পদ্মা, সেখানে এখন কেবল থৈ থৈ পানি, বাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই। শত মাথা কুটলেও সেই জায়গাটি এমনকি চোখে দেখাও সম্ভব নয়। এরাও শুধু বাড়ি বা জমি হারায়নি – হারিয়েছে স্মৃতি, সম্পর্ক ও শেকড়।

ছোটবেলা থেকে দেখলেও অঞ্জন যেন এই প্রথমবারের মতো এদের দুঃসহ বেদনার ব্যাপারটিকে উপলব্ধি করতে পারলো।

অঞ্জনের মনটা খারাপ হচ্ছিলো ক্রমাগত। উদাসপুরের চেহারা তো এমন ছিলো না। ইছামতির দুই পাড় ছিলো শূন্য – খা খা শূন্যতার ভেতর একটি একাকী নদী অবিরাম বয়ে চলেছে – এই অসামান্য দৃশ্যটিই সে মনে গেঁথে রেখেছিলো। জীবনে যতবার যতজনের কাছে সে ইছামতির কথা বলেছে, এই বর্ণনাটিই ব্যবহার করেছে – এমনকি শান্তার কাছেও। এখন শান্তাকে কি বোঝানো যাবে – খা খা শূন্যতার ভেতর বহমান এই নদীটির চেহারা – যেখানে সে নিজেই দেখতে পাচ্ছে এক মৃত নদীর দুই পাশে অজস্র দরিদ্র ঘরদোর?

বাড়ির পথে এখন আর বেশিদুর হাঁটতে হবে না – আইয়ুব আলি ঠিকই বলেছে। অঞ্জনের অবাক লাগে। এক যুগ আগে পদ্মা ছিলো ১০/১২ কিলোমিটার দুরে, এখন এক কিলোমিটারও হবে না। পদ্মার এ কি সর্বগ্রাসী রূপ! কত বাড়ি যে ভেঙে গেছে, কত মানুষ যে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে! পরিচিত সেই মানুষগুলো এখন কোথায় আছে, কেমন আছে কে জানে!

১১

একটা বাঁক ঘুরতেই নিজেদের বাড়ি চোখে পড়ে, আর আমুল কেঁপে ওঠে অঞ্জন। এই তার শেকড়। এই বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিলো, এই বাড়িতেই সে বেড়ে উঠেছে। শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের প্রথম লগ্নের সাধ ও স্বপ্ন মিশে আছে এ বাড়ির পরতে পরতে। ষোলটি বছর! কম সময় নয় তো! এবং, জীবনের মধুরতম সময় অবশ্যই।

অঞ্জন আলতো করে শান্তার হাত ধরে বলে – ওই যে বাড়ি। শান্তাও কি কেঁপে ওঠে একবার? যে বাড়ি সম্বন্ধে সে ইতোমধ্যেই হাজারখানেক গল্প শুনে ফেলেছে, প্রথমবারের মতো সেটাকে চোখের সামনে দেখে একটা অদ্ভুত অসংজ্ঞায়িত অনুভূতি হয় তার। গল্পে শোনা বর্ণনার সঙ্গে দৃশ্যমান বাস্তবতা মেলাতে চেষ্টা করে সে। বাড়িটা বিশাল বলেই মনে হচ্ছে; বাড়ির উত্তর ও দক্ষিণে আরো দুটো বড় বাড়ি থাকার কথা – ডাক্তার বাড়ি ও চাচার বাড়ি। কিন্তু যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো প্রায় ভাঙাচোরা-জরাজীর্ণ। পশ্চিমে একটু দুরে খা খা শূন্যতা ও ইছামতি থাকার কথা, কিন্তু ওদিকেও দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট দরিদ্র ঘরদোর, ইছামতির নামগন্ধ নেই, শুধু পুবদিকে বিস্তির্ণ মাঠ পেরিয়ে প্রধান সড়কটি ঠিক আছে। আগে শোনা বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবের এই মিল অমিলের ব্যাখ্যা তার জানা নেই। হয়তো এ বাড়িগুলো নতুন, আগে নিশ্চয়ই ছিলো না, থাকলে তো অঞ্জন বলতোই। কিন্তু এসব ভাববার সময় এটা নয়। অঞ্জন অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ হয়ে আছে। বিয়ের পর থেকে তাকে এতটা গম্ভীর কখনো দেখেনি শান্তা। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। খুব উচ্ছল হয়ে উঠলে কি সেটা মানানসই হতো, যেখানে ফেরা হচ্ছে প্রায় একযুগ পর, আর ঘটে গেছে একেকটি জিনিসের আমুল পরিবর্তন!

অচিরেই পথ শেষ হয়। তারা গিয়ে বাড়ির সীমানায় পা রাখে। প্রথমেই একটা মসজিদ, তারপর কবরস্থান। ছয়টি বাঁধানো কবর পরিপাটি হয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে। শান্তা এর একটিও চেনে না। অঞ্জন পাঁচটি আগেই দেখেছে – দাদার মা ও বাবা, দাদু ও দাদা, আরেকটা বাবার কবর। শেষেরটা মা র নিঃসন্দেহে। অঞ্জন এগিয়ে যায়, একটু থমকে দাঁড়ায়, তারপর একটার পর একটা কবর ছুঁয়ে সালাম করে। দেখাদেখি শান্তাও। একটা কবর ছুঁয়ে তাকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে দেখে শান্তাও গিয়ে বসে পড়ে। অঞ্জনের চোখ ভিজে পানি গড়িয়ে পড়ছে, আস্তে করে, প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে সে কেবল বলতে পারলো – আমার মা – শান্তা অঞ্জনকে কখনো এভাবে কাঁদতে দেখেনি, সহসা তাই বুঝে উঠতে পারে না, তার কি করা উচিত। অঞ্জনের হাত ধরে সে কেবল

বলে – এসো। কিন্তু ওকে সে কোথায় নিয়ে যাবে? এ বাড়িতে সে নতুন অতিথি, তাকেই তো বরণ করে নেবার কথা, কিন্তু কে-ই বা তা করবে? বোনদের ওপর রাগ হলো শান্তার, তাদের অন্তত একজনের কি আসা উচিত ছিলো না? সে তো কিছুই চেনে না, এখন সে করেটা কি? আইয়ুব আলিকেও দেখা যাচ্ছে না, উল্টো চারপাশে কিছু অচেনা মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। অঞ্জন অবশ্য সচেতন হয় অচিরেই – শান্তাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। বাড়িটা সত্যিই অনেক বড় – এবার বোঝা যাচ্ছে। মসজিদ, কবরস্থান পেরিয়ে আরেকটু সামনে এগুলে একটা ঘর। তারপর অনেকখানি খালি জায়গা পেরিয়ে জীর্ণ বাউন্ডারি দেখা যাচ্ছে। অঞ্জন বউকে নিয়ে সেটা পার হলে শান্তার বিস্ময় আরো বাড়ে। বাউন্ডারির বাইরেটা তাহলে আসল বাড়ি নয়! ভেতরে আরো অনেকটা জায়গা জুড়ে উঠোন, তারপর তিনটে বড়, একটা ছোট ঘর। এক সময় এ বাড়িতে প্রাণ ছিলো – আয়োজন দেখলেই বোঝা যায়। এখন এ ঘরদোর মৃত, ধুলোমলিনতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো ঘরটির দরজা ধরে এক বৃদ্ধা দাঁড়ানো, সম্ভবত হাঁটার ক্ষমতা নেই, দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। অঞ্জন গিয়ে তার পা ছুঁয়ে সালাম করে,

কেমন আছেন ফুপু?

অঞ্জনের দেখাদেখি শান্তাও সালাম করে উঠে দাঁড়ালে বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন। অঞ্জন মৃদুস্বরে – আপনার বউ মা – বলে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, আর তিনি সে কথায় কান না দিয়ে শান্তাকে – আমার অঞ্জনকে তুমি ফিরিয়ে এনেছো মা, তুমিই ফিরিয়ে এনেছো, এতদিনেও বাড়ির কথা ওর মনে পড়েনি– বলতে থাকলে শান্তা সংকোচে জড়োসড়ো হয়ে যায়। আর কেউ না জানুক, সে তো জানে – এই বাড়ির কথা অঞ্জনের মনে পড়ে কী না, এই বাড়ি ওর কতখানি জুড়ে আছে!

ফুপু শান্তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান। বিকেল হয়ে এসেছে। রোদের তীব্রতা কমে গিয়ে এর হলুদ রঙ কমলা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কি নামবে সেই বিখ্যাত সন্ধ্যা, যার কথা শান্তা ইতিমধ্যেই কয়েকশ বার শুনে ফেলেছে অঞ্জনের কাছে? কিন্তু সন্ধ্যার বদলে উঠোন জুড়ে মানুষের ঢল নামে। শান্তা প্রথমে ঘটনাটা বুঝে উঠতে পারে না। ঝিটকা থেকে এ পর্যন্ত পুরো পরিস্থিতিটা তার প্রতিকূলে – অঞ্জন তো ঠিকমতো কথাই বলছে না। এই এখন যেমন, বহু ভেবে তাকে বের করতে হলো – এতগুলো মানুষ এসেছে শুধু তাদেরকে দেখতে! কী অদ্ভুত বিষয়! এতকাল সে দাদার কাছে এ বাড়ির গল্প শুনে এসেছে – প্রায় কিংবদন্তির মতো; শুনেছে – এই বাড়ির পুরুষরা ছিলেন তাদের সময়ের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, আর তারা থাকতেন স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে। মানুষের সকল সংকট ও সম্ভাবনায়, সুখে ও দুঃখে, আয়োজন ও অনুষ্ঠানে, আনন্দ ও বেদনায় তাঁরাই ছিলেন তাদের আশ্রয় ও নির্ভরতা। এসব কথার অর্থ শান্তা এখন বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে – একজন মানুষ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হলে তাকে দেখতে জনতার ঢল নামে! অথচ তার স্বামীটি নিতান্তই সাধারণ জীবনযাপনকারী মানুষ – কোনো রাজনৈতিক নেতা নয়, এম.পি বা মন্ত্রী নয়, কোনো ফিল্মস্টার বা নিদেনপক্ষে বিখ্যাত কোনো খেলোয়াড়ও নয়। তার শরীরে কি তবে এই পরিবারের ঐতিহ্যের চিহ্ন আঁকা আছে, আর মানুষ এসেছে সেটাই খুঁজে নিতে? নইলে এত ভিড় হবে কেন? শুধু শান্তাই

কেন, অঞ্জনকেও একটু বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। একবার শুধু মৃদুস্বরে, সম্ভবত শান্তাকে শোনানোর জন্যই, তাকে বলতে শোনা গেছে – মুশকিলে পড়লাম তো! এদের কাউকেই তো চিনতে পারছি না।

দেখতে আসা লোকজনের অধিকাংশই একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ নানা রকমের মানুষ স্রেফ দাঁড়িয়ে আছে। কী বিব্রতকর! দু চারজন – এরা সম্ভবত পূর্ব পরিচিত – এসে, বাবাজি ভালো আছেন তো– ভাইজান কদ্দিন পরে আইলেন – এই ধরনের বাক্য মোলায়েম ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে অতি উৎসাহী কিছু যুবক – এই তুমরা যাও তো এহান থে, ভাইজান রে একটু নিঃশ্বাস নিবার দ্যাও, যাও যাও পরে আইসো – বলে লোকজনকে হটিয়ে দিয়ে নিজেরাই কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। নিঃশ্বাস আর নেয়া যাচ্ছে না। শান্তা হাঁপিয়ে ওঠে – এতগুলো মানুষ হা করে তাকিয়ে আছে, মাঝে মাঝে তাদের ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছে – বউডা একেবারে পরীর মতো সুন্দুর রে– এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে কি পরিত্রানের কোনো উপায়ই নেই? বেন্ড কি নেই, যে তাকে এতগুলো কৌতূহলী চোখের সামনে থেকে দূরে নিয়ে যাবে – অঞ্জন থাকুক তার গ্রামের মানুষ নিয়ে। অনেক দূরে অবশ্য ফুপুর ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে – এই তোরা একটু সরে যা না, বউটা নতুন এলো, একটু বিশ্রাম নিতে দে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? মুরুব্বি গোছের কিছু লোক অবশ্য ফুপুর অভ্যাহত বকুনিতে তৎপর হলে ভিড় কিছুটা কমে। আর বাবাজি হেই উদাসপুর আর নাই, পদ্মা ভাঙুনি লোক দে ভইরা গেছে – বললে অঞ্জন বুঝতে পারে, এই লোকগুলোকে কেন এত অচেনা লাগছে। এরা নিশ্চয়ই দূর কোনো গ্রামের লোক ছিলো, এক যুগ আগে দেখা সাক্ষাৎও নিশ্চয়ই কম হত। এরকম সত্যিই ছিলো না উদাসপুরের চেহারা। হাড় জিরজিরে অসংখ্য মানুষ, ক্ষুধা দারিদ্র আর রোগ শোকে ক্লান্ত এত মুখ আগে কল্পনাই করা যেত না। সেই স্বচ্ছল সুখী জনগোষ্ঠী কি হারিয়ে গেছে এই গ্রাম থেকে? নাকি আগেও মানুষ এরকমই ক্লান্ত ও বিবর্ণ ছিলো, কিন্তু তারই দেখার চোখ ছিলো না? কিংবা, শৈশব কৈশোরের স্মৃতিগুলো সম্ভবত প্রতারণাময় – গ্লানি ও বেদনার অংশটুকু যথাসম্ভব ঝেড়ে ফেলে, আনন্দ ও প্রাপ্তির অংশটুকু জমা করে রাখে। হয়তো এজন্যই এ গ্রামের মানুষগুলোর সুখী ও স্বচ্ছন্দ অংশটুকু সে মনে রেখেছে – অন্যকিছু নয়। বর্ষার সময় ৩/৪ মাস এ অঞ্চলের মানুষদের কোনো কাজ থাকে না; কেবল পুঁথিপাঠের আসর, মাছ ধরা আর আয়োজন করে ছেলাভাজা খাওয়া ছাড়া। এই কথাটি শান্তাকে বলাতে ও প্রশ্ন করেছিলো – তাহলে তাদের দিন চলে কীভাবে? গ্রামের মানুষদের কি এত সঞ্চয় থাকে যে, ৩/৪ মাস কাজ না করলেও তাদের খাওয়া পড়ার কোনো অসুবিধা হবে না? – অঞ্জন এই প্রশ্নে চমকে উঠেছিলো। সত্যিই তো! সে কেবল গ্রামের মানুষদের আনন্দের অংশটুকু দেখেছে – তাদের বাড়িতে হাঁড়ি চড়েছে কী না সে খবর তো রাখেনি কখনো। আজ এতদিন পর অঞ্জনের মনে হলো – উদাসপুরের যে অসাধারণ রূপটি সে মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছিলো তার মধ্যে বাস্তবতার ভাগ সামান্যই, কল্পনাই বেশি। মানুষের ক্লান্তি, ক্ষুধা, দারিদ্র, পরাজয় আর হতাশার কথা সে জানতেই চায়নি কোনোদিন। সন্দেহ নেই, পদ্মার ভাঙনের ফলে বাস্তুহারা মানুষের চাপে উদাসপুরের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে – ফসলি জমি কমে গেছে, ঘনবসতি তৈরি হয়েছে, কাজ করার সুযোগ বাড়েনি; কিন্তু তার মনের মধ্যে গড়া উদাসপুরের স্বপ্নের মূর্তি হয়তো আগেও অমন স্বপ্নের মতো ছিলো না।

বয়স্কদের তৎপরতায় আশেপাশের লোকজন একটু কমেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বাড়ির বাইরে হল্লা হচ্ছে, কে জানে, হয়তো, সেখানে ভিড় বাড়ছে। কি চায় এই লোকগুলো? শুধু কি দেখতেই এসেছে, নাকি তাদের কিছু প্রত্যাশা আছে অঞ্জনের কাছে? অঞ্জন কি-ই বা দিতে পারে তাদের? বহুদূরে চলে যাওয়া এক অচেনা ভীনদেশী সে এখন, এই লোকগুলোর প্রত্যাশার কূল কিনারা পাবার সাধ্যই তো তার নেই, পূরণ করা দূরের কথা। অথচ, এই এখন, অঞ্জনের মনে হচ্ছে, সারি বেঁধে মানুষ আসছে দূর দূরান্ত থেকে, বাইরে হল্লা করছে – কারণ, তারা অঞ্জনের দেখা পেতে চায়, তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তার কাছ থেকে কিছু পেতেও চায়। কি পেতে চায়? এই লোকগুলো কি এখন বলবে – বহুকাল ধরে বংশানুক্রমে আমরা আপনাদের সম্মান করে এসেছি, ভালোবেসে এসেছি, আমাদের ভালো-মন্দে, প্রত্যাশা-প্রাপ্তিতে, আনন্দ-বেদনায় আপনাদের কাছেই ছুটে এসেছি বরাবর। আপনার পিতা, আপনার পিতামহ, তাঁর পিতা ও পিতামহ, তাঁরও পিতা ও পিতামহ অর্থাৎ আমাদের চেনা অচেনা আপনার সকল পূর্বপুরুষ – আমাদের বাবা, দাদা, তার বাবা ও দাদা এবং তারও বাবা ও দাদা অর্থাৎ আমাদের সকল পূর্বপুরুষের কাছে সম্মান ও ভালোবাসা পেয়ে এসেছেন। তাঁরা সেই সম্মান ও ভালোবাসার মর্যাদাও দিয়েছেন, হয়তো এ জন্যই এই অজপাড়াগাঁ ছেড়ে তাঁরা কখনো চলে যাননি, আমাদের জন্য যথাসাধ্য করেছেন; অথচ আপনি আমাদের প্রত্যাশার বিন্দুবিন্দুতে থেকেও বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, একবারও ভাবেননি আমাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই, আমাদের জন্য কথা বলার কোনো মানুষ নেই – আপনি চলে গেলে আমাদের তাহলে কি হবে! আমাদের সম্মান ও ভালোবাসার যে অমর্যাদা আপনি করেছেন – তার জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে; আমাদের সবকিছু কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দিতে হবে। বাইরে হল্লা বাড়ে – আর অঞ্জন ভীত হয়ে পড়ে। কি জবাব দেবে সে এই লোকগুলোকে? এরা যে ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছে, তা হয়তো নয়। কিন্তু অঞ্জনের মস্তিষ্কে বিষয়টি এভাবেই ঢুকে পড়েছে – কিছুতেই তাড়াতে পারছে না। অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, নইলে গুটিশুটি ও সংকুচিত হয়ে বসে থাকা শান্তাকে তার নিশ্চয়ই চোখে পড়তো। এ যাত্রায় দুজনেই অবশ্য ফুপুর সহায়তায় উদ্ধার পায়, তিনি যখন বলেন – ও খোকা, হাত মুখ ধুয়ে ও ঘরে আয়, খেতে দিচ্ছি। বউমা, এসো, আমার সঙ্গে এসো – তখন দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ও ঘর – মানে পুবদিকে পুকুর ঘেঁষা ছোট ঘরটি, অঞ্জনরা যেটাকে নতুন ঘর বলতো – এবং বাবা এটা তৈরি করেছিলেন অঞ্জনের জন্যই, বিশেষভাবে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগের তিনটে বছর সে ও ঘরেই কাটিয়েছে। কত রাত কেটেছে তার ওই ঘরে – একাকী, নিঃসঙ্গ। বোনরা তখনদিনে ঢাকায়, মা ও বাবা বড় ঘরে। অঞ্জন সেই প্রথম যেন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলো – একদম নিজের একটি ঘর পেয়ে। নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতার সঙ্গে সেই থেকে প্রেম হলো তার। এই ঘরে বসেই সে দেখতে পেতো প্রকৃতির অদ্ভুত ঋতুপরিবর্তন। একটি দৃশ্য হঠাৎ তার মনে পড়লো। বর্ষায় – মাঠে থৈ থৈ পানি, মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, আর চাঁদনি রাতে ঢেউগুলো চিকচিকে জোসনা মেখে বয়ে যাচ্ছে। কী যে অসাধারণ এক দৃশ্য, না দেখলে বোঝা যাবে না। কথাটা শান্তাকে বলা দরকার মনে হলে সে এতক্ষণে বউয়ের দিকে নজর দেয়। অন্যায় হচ্ছে, খুবই অন্যায় হচ্ছে –

মেয়েটা এখানে নতুন, তা-ও বউ, অথচ একেবারেই নজর দেয়া হচ্ছে না। এবার সে শান্তার হাত ধরে – এসো ওই ঘরে যাই। জানো ওখানে আমি থাকতাম। বর্ষায়... ফিসফিস করে তার বর্ণনাও শুরু হয়ে যায়। শান্তা প্রথমত এবটু প্রতিক্রিয়াহীন হলেও ও ঘরে গিয়ে তার সত্যি মন ভালো হয়ে যায়। ছোটখাটো একটা ঘর, জানালা ঘেঁসে একটা খাট, সেখানে ধবধবে সাদা চাদর, টেবিলে ধোঁয়া ওঠা ভাত। এই সন্ধ্যেবেলা ভাত খেতে হবে! তা-ও ভালো। তবু তো এত ভিড় থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে! অবশ্য তা বেশিক্ষণের নয়, ভাত খাওয়া শেষ হতে না হতে আবার দু একজন করে লোকজনের আগমন ঘটতে থাকলে, অঞ্জন – তুমি একটু রেস্ট নাও, আমি আসছি– বলে বাইরে বেরোয়। আর ঠিক তখুনি – উদাসপুরে যেন ঝপ করে সন্ধ্যা নেমে আসে। বিকেলের আলো কখন মুছে গেছে, টের পাওয়া যায়নি। কমলা রঙের একটা ম্লান আভা চরাচরে ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন মন খারাপ করা একটা হাওয়া বইছে চারপাশে। এক অদ্ভুত বিষণ্নতা আর উদাসীনতায় পুরো পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে গেছে। এই আকাশ ও মাটি, পাখি ও বৃক্ষসমূহ যেন চিরচেনা এই পৃথিবীর নয়, যেন বা কোনোদিন স্বপ্নে দেখা হয়েছিলো এই জগৎটির সঙ্গে। ঘরের পাশ দিয়ে মেঠোপথ ধরে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোও কি এই কালের? তাদের চোখেমুখে সহস্র বছরের স্মৃতিচিহ্ন আর উদাসনীতা যেন মাখামাখি হয়ে আছে বলে মনে হয় শান্তার। এই সন্ধ্যার কথাই কি বলেছিলো অঞ্জন? শান্তার চোখ ভিজে ওঠে অকারণেই – এরকম সন্ধ্যা সে দেখেনি কখনো – এত বিষণ্ন, এত উদাসীন।

ওদিকে অঞ্জনের আর সন্ধ্যা দেখার সুযোগ হচ্ছে না। তাকে কথা বলতে হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে হচ্ছে। লোকজন এত দ্রুত খবর পাচ্ছে কি করে কে জানে! আর খবর পেলেই কি? এ রকম দল বেঁধে দেখা করতে আসার কোনো মানে হয়! এদের কি কোনো কাজকর্ম নেই? পরমুহূর্তেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে তার। বাবার কাছে কত যে লোক আসতো! এই গ্রাম বা আশেপাশের গ্রাম ছাড়াও দুর-দুরান্ত থেকে পরামর্শ নিতে বা উপদেশে শুনতে বা স্রেফ বাবার কথা শোনার লোভে আসা লোকজনের যত্ন-আত্তি করতে করতে মা র জীবনটা তো রান্নাঘরেই কেটে গেলো। সে তো তাদের রক্তই বহন করে চলেছে তার শরীরে, মানুষকে দোষ দিয়ে আর কি লাভ?

উদাসপুরে রাত নেমেছে – নিঝুম হয়ে আসছে সবকিছু। অঞ্জন যথাসম্ভব ভদ্রভাবে লোকজন বিদায় করে এসে দেখলো – শান্তা নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। মেয়েটার জন্য হঠাৎ খুব মায়া হলো তার। এ বাড়ির একমাত্র বউ – এই প্রথমবারের মতো এ বাড়িতে এলো – অথচ দ্যাখো কী অবহেলায় ঘুমুচ্ছে! আহা, যদি মা-বাবা বেঁচে থাকতেন, তাহলে? অঞ্জন গিয়ে খুব মমতায় বউয়ের মাথায় হাত রাখলে শান্তার ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে একটু লজ্জাই লাগে তার। কিন্তু অঞ্জনের ঠোঁটে লেগে থাকা মৃদু মায়াময় হাসিটি তার লজ্জা কেড়ে নিয়ে বরং তাকে আহ্লাদী করে তোলে। বলে,

অনেক রাত হয়ে গেছে নাকি?

না, ন-টার মতো।

ও। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম। – তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে – এখানকার সন্ধ্যাটা সত্যিই খুব অদ্ভুত। এমনটি আর কখনো দেখিনি। তুমি যখন বলেছিলে, আমি এর অর্থ বুঝিনি। মনে হতো ওসব তোমার কল্পনার রঙ – পৃথিবীর সব জায়গায় সন্ধ্যা ব্যাপারটা একই রকম। কিন্তু এখানে এসে ভুল ভাঙলো আমার। এখন মনে হচ্ছে – আসলে জীবনে কখনো এই ব্যাপারগুলো খেয়ালই করা হয়নি। ঢাকায় যে কখন সকাল হয়, কখন সন্ধ্যা আসে, কবে পূর্ণিমা হয়, আর কবে অমাবস্যা টেরই পাওয়া যায় না। আর ঋতুর পরিবর্তন! সেটা টের পাওয়া তো আরো কষ্টকর। সারা বছরই ভ্যাপসা গরম, কোনটা যে গ্রীষ্ম আর কোনটা বর্ষা, এমন কি শীতকালটা পর্যন্ত এসেই যাই যাই করে। শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত এসব ঋতুর তো অস্তিত্বই নেই ঢাকায়। এসব কেবল বইয়ে পড়া ঋতু – তার রূপবৈচিত্র্য বোঝে কার সাধ্য? শহরের ছেলেমেয়েদের জন্য বোধহয় নতুন করে লিখতে হবে – বাংলাদেশের গ্রামে ছ-টি ঋতু কিন্তু শহরে দুটো – গ্রীষ্ম ও শীত। শীতকাল টা দু-মাসের – বাকি দশমাসই গ্রীষ্মকাল।

শান্তাকে একসঙ্গে হঠাৎ এত কথা বলতে দেখে অঞ্জন অবাক হয়। খুশিও। তার একটা ভয় ছিলো – উদাসপুরের যে সব বর্ণনা সে দিয়েছে, তার কতটুকু যে অবশিষ্ট আছে সেটা তার নিজেরই জানা ছিলো না – যদি শান্তার এই পরিবর্তিত রূপ ভালো না লাগে, তাহলে আর কোনোদিন এসব নিয়ে কথা বলা যাবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে – ওর ভালো লাগবে। প্রথম সন্ধ্যাটিই তার ভালো লেগেছে – আসল সৌন্দর্য তো এখনো দেখেইনি। কালকে সন্ধ্যাটা দেখতে হবে পদ্মার পাড়ে বসে। ও তাহলে বুঝতে পারবে – এমন সুন্দর-গম্ভীর-উদাসীন-বিষণ্ন সন্ধ্যারও জন্ম হতে পারে এই পৃথিবীতে! অঞ্জন মন দিয়ে শান্তার কথা শুনছিলো – শুনতে শুনতেই জিজ্ঞেস করে – তোমার ভালো লাগছে এখানে এসে?

হ্যাঁ, খুব। আচ্ছা, এই যে এত মানুষজন এলো, ব্যাপারটি কি বলো তো? আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

আমিও যে ঠিক বুঝতে পেরেছি তা নয়। এটা আমার কাছেও খুব অপ্রত্যাশিত ঘটনা, কখনো ভাবতেও পারিনি, এই অঞ্চলের লোকজন আমাকে এইভাবে গ্রহণ করবে। আমি তো কোনো সম্পর্কই রাখিনি এদের সঙ্গে – যেমন রেখেছিলেন বাবা বা দাদা। এই সম্মান বা ভালোবাসা পাবার যোগ্যই নই আমি। যত দূর বুঝতে পারছি – এইসব লোকের একটা অদ্ভুত ধারণা হচ্ছে – তাদের জীবনে যে বিবিধ সংকট রয়েছে, বাবা বা দাদা যেমন সেগুলোর একরকম সমাধান দিতেন, আমিও তা দিতে পারবো। কিন্তু ওদের কি করে বোঝাই যে, তাদের জীবনের সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষদের পরিচয় ছিলো, সম্পর্ক ছিলো, তাঁরা এদের সমস্যা বা সংকটের ধরনটি বুঝতেন। আমি তো সেগুলো বুঝতেই পারবো না – এদের জীবন যাপনের সঙ্গে আমার তো কোনো পরিচয়ই নেই।

তোমার কাছেও তাদের অনেক প্রত্যাশা, তাই না?

তাই তো মনে হয়। কিন্তু এদের জন্য আমার কি-ই বা করার আছে? আমার দাদা বা বাবার সময়ের বাস্তবতা যে পাল্টে গেছে, এরা তো তা বোঝে বলে মনে হয় না।

আচ্ছা, বাবা যে তাঁর উজ্জ্বল ব্যারিয়ার ছেড়ে চলে এসেছিলেন, এদের কথা ভেবে তুমি পারবে ওরকম করতে?

প্রশ্নটা হয়তো আমারই করার কথা ছিলো তোমাকে, যে, আমি যদি তেমন কিছু করতে চাই তাহলে আমার মায়ের মতো তুমিও ও রকম সেক্রিফাইস করতে পারবে কী না। তুমিই যখন প্রশ্নটা তুললে, বুঝতে পারছি – তোমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমার দিক থেকে আছে। দ্যাখো, বাবার যেমন উজ্জ্বল ক্যারিয়ার ছিলো, লোভনীয় একটা চাকরি করতেন, ক্ষমতা ও সুযোগের দ্বার অবারিত ছিলো তাঁর সামনে – আমার তেমন কিছু নেই। তাঁর তুলনায় আমি নিতান্তই ছাপোষা। আমার পূর্বপুরুষদের মতোই আমার মধ্যেও খানিকটা বৈষয়িক উদাসীনতা আছে। নইলে তো আমেরিকায় এর চেয়ে অনেক ভালো ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু আমার সমস্যাটা অন্য জায়গায়। বাবা কেন চাকরি-বাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে এসেছিলেন, দাদা কেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি ত্যাগ করেছিলেন, বা তাঁর পিতা কেন খান বাহাদুর উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন – আমি তা জানি না। এগুলোকে আমি কেবল ঘটনা হিসেবে জানি, কিন্তু এর পেছনের কারণটি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো গ্রাউন্ড ছিলো, সেটা না জানলে তাদের এই প্রবণতার ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। বাবার ব্যাপারটা তবু খানিকটা বোঝা যায়, তিনি অন্তত তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে সবার কাছে একটা কারণ দাঁড় করিয়েছিলেন; কিন্তু এটাকেই আমি, কেন জানি না, একমাত্র কারণ হিসেবে মেনে নিতে পারি না। কিংবা ধরো, এটাই যদি কারণ হয়ে থাকে, তবুও আমি এই কনসেপ্টের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। সন্তানদের শেকড় শুধু উদাসপুরেই কেন, সমগ্র দেশেই নয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তর কি বাবার কাছে ছিলো? স্বীকার করি, নিজের পক্ষে তাঁর অনেক যুক্তি ছিলো, এবং সবাই তাঁর সেসব যুক্তির কাছে হেরে যেতো, কিন্তু নিজেকে যে তিনি উদাসপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন, এই সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করি না। বাবা বা দাদার মেধা সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই। অন্তত বাবার সঙ্গে আমার যতটুকু কথা হয়েছে – তাতে তাঁর যে অগাধ জ্ঞান ও ব্যতিক্রমী চিন্তার পরিচয় পেয়েছি – তার তুলনা মেলা ভার। তিনি সেই চিন্তাকে আরো বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারতেন! সেটাই উচিত ছিলো, কর্তব্যও ছিলো। আমাদের সমাজে চিন্তাবিদের খুব অভাব, অথচ তাঁর মতো একজন মানুষ – চিন্তার জগৎকে ছড়িয়ে না দিয়ে উদাসপুর এসে বসে রইলেন – এটা কেমন কথা? তাঁর চাকরি ছাড়া নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই, ক্ষোভও নেই। তাঁর সামাজিক স্ট্যাটাস, ক্ষমতা, পদমর্যাদা ইত্যাদি নিয়েও আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। একজন আমলা পুত্র হিসেবে সমাজে পরিচিত হওয়ার মধ্যে আমি কোনো গৌরব দেখি না। কিন্তু তিনি যে তাঁর চিন্তাকে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কোনো চেষ্টা করেননি – এটা নিয়ে আমার দুঃখবোধ আছে। কোনো লিখিত রূপও রেখে যাননি তিনি, এমনকি ডায়রি পর্যন্ত লিখতেন না বাবা। কেন? তাঁর কি ভাবা উচিত ছিলো না যে, তাঁর ছেলেমেয়েরা এই ভাবনাগুলো যাচাই বাছাই করে দেখবে? একই সমস্যা আমার দাদারও। তিনিও কিছুই লিখে যাননি, যে, তাঁর চিন্তার সঙ্গে ভবিষ্যত বংশধরদের পরিচয় ঘটবে। ফলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোকমুখে কিছুদিন বেঁচে থাকা ছাড়া তাঁদের সমস্ত কিছুরই ইতি ঘটে গেছে। আমি এর কোনো মানে খুঁজে পাই না, আর তাই এই একই ঘটনার পুণরাবৃত্তি ঘটাতে সবকিছু ছেড়ে উদাসপুর চলে আসার জন্য ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাই না। তাছাড়া দাদা বা বাবার মতো কোনো মতবাদ বা দর্শনে আমার অত গভীর আস্থা জন্মেনি এখনো। আমি বরং অনেকখানিই

সংশয়ী। নিজ দর্শনের প্রতি আপোসহীনভাবে দৃঢ় একজন মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, একজন সংশয়ী মানুষের পক্ষে কিন্তু তা করা সম্ভবও নয়।

কথা হয়তো আরো বলতো অঞ্জন, কিন্তু ফুপুর ডাকে বাধা পড়লো – ও খোকা, রাত যে অনেক হলো, খেয়ে নে।

ঘড়িতে দেখা গেলো, দশটা। গ্রামের জন্য অনেক রাতই বটে। পুরো গ্রামটা নিঝুম হয়ে গেছে। সেই আগের মতো। ঘর থেকে বেরোতেই অঞ্জন আর শান্তা একসঙ্গে চমকে উঠলো। ঘরে বসে টের পায়নি – বাইরে এত জোসনা। মস্ত বড়ো এক চাঁদ উঠেছে – কতদিন পর এই চাঁদের মুখ দেখা। গ্রীষ্মের মেঘহীন নির্মল আকাশ। জোসনায় যেন ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। আহ্, কতদিন দেখা হয়নি এমন দৃশ্য! ঢাকায় তো বোঝাই যায় না – কখন পূর্ণিমা আর কখন অমাবস্যা! এটা কি কোনো কোইন্সিডেন্স – ভাবলো অঞ্জন – এই যে না জেনেই শুক্লপক্ষকেই বাড়ি আসার জন্য বেছে নেয়া?

বড় ঘর থেকে খেয়ে এসে তারা উঠোনে বসলো। অঞ্জন আবার বিষণ্ন আর উদাসীন হয়ে উঠেছে। শান্তাও। তার মনে পড়ছে – কক্সবাজারের সেই জোসনাপ্লাবিত রাতের কথা। কায়সার বলেছিলো – আজকে তোদের স্বাধীনতা দিলাম। সত্যি ওই একটি মাত্র রাত ছিলো স্বাধীনতার। আচ্ছা, কায়সারের সঙ্গে কি আমার প্রেম হতে পারতো না – অঞ্জন যেমন জিজ্ঞেস করেছিলো! ওকে কোনোদিন জানানোই হলো না – ও যে আমার কতটা পছন্দের ছিলো। কেন জানালাম না? প্রত্যাখানের ভয়? না কি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায়? ওর সঙ্গে প্রেম হলে কেমন হতো এই জীবন? এর চেয়ে ভালো? ও কি অঞ্জনের চেয়েও উদার ও মায়াময় ও ভালোবাসাপূর্ণ? এসব ভাবতে ভাবতেই তার মনে হলো, আমার মধ্যে কি কোনো অপূর্ণতা আছে – নইলে এসব ভাবছি কেন? – ভাবছে যে কেন, তা না জানলেও এরকম ভাবনা যে সবার মধ্যেই মাঝে মাঝে ভর করে তা সে জানে। যে জীবন মানুষ পায়, তার চেয়ে অন্যরকম একটি জীবনের সম্ভাবনার কথা কে-ই বা ভুলে থাকতে পারে? কায়সারের সঙ্গে যদি তার প্রেম হতো, বিয়ে হতো তাহলে জীবনটা নিশ্চিতভাবেই অন্যরকম হতো – সেই অন্যরকমটা কি রকম তার স্কেচ অবশ্য সে করতে পারে না, কিংবা সেটা এখনকার জীবনের চেয়ে ভালো না খারাপ হতো তা-ও সে জানে না, তবু সেই জীবনের জন্য যদি গোপন একটি প্রেম তার থেকেই থাকে তা কি খুব দোষের কিছু? কায়সার তাকে অনেকখানি বুঝতো, বোঝাতোও অনেক – মানুষের জীবনের বহিরঙ্গ দেখে তাকে বিচার না করে তার ভেতরের দিকে তাকাতে শিখিয়েছিলো কায়সারই। কে জানে ওরও হয়তো খানিকটা বিশেষ টান ছিলো শান্তার প্রতি, শান্তার মতোই যা সে অপ্রকাশিতই রেখে দিয়েছিলো। প্রেম হয়নি, কিন্তু কায়সার তার সর্বনাশ করে দিয়েছে ঠিকই, নইলে সে তো অঞ্জনকে নিয়ে অসুখী নয়, তবু কেন এই জোসনাপ্লাবিত আকাশের নিচে বসে তার মনে হচ্ছে – অঞ্জন নয়, এখন, এই মুহূর্তে তার পাশে কায়সারকে পেলেই সে সুখী হতো! কেন মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে একমাত্র কায়সারই বলতে পারে, আজকে তোদের স্বাধীনতা দিলাম – যার যা ইচ্ছে কর! কেন এসব কথা মনে পড়ছে আর চোখ ভিজে উঠতে চাইছে! কেন মনে হচ্ছে মেয়েরা যে স্বাধীন নয়, যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা যে তাদের নেই, ছেলেরা না বলে দিলে তারা যে

নিজেদেরকে স্বাধীন বলে অনুভবই করতে পারে না – এই জিনিসটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে কায়সার একটা সর্বনাশ করে দিয়েছে। এর চেয়ে বোধহয় অন্ধ থাকাই ভালো ছিলো! শান্তার কান্না পাচ্ছিলো – প্রায় বিনা কারণেই, মনে হচ্ছিলো – অঞ্জনকে নিয়ে সে সুখীই হয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু কায়সার তাকে যেমন শেখাতো অনেককিছু, অঞ্জন তা করে না, বরং উল্টো তাকেই অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে হয় – এই বৈপরীত্য বড়ো সাংঘাতিক।

শান্তা এইসব ভাবছিলো, বিষণ্ন হয়ে যাচ্ছিলো, তার চোখ কান্নাভেজা হয়ে উঠছিলো, কিন্তু অঞ্জনের সেদিকে নজরই ছিলো না। তার মনে পড়ছিলো ছোটোবেলার কথা। এই বাড়ির প্রতিটি ধুলিকণার সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো। এরকম জোসনার রাতে ভাইবোনরা মিলে কত রকমের খেলার আয়োজন করে ফেলতো তারা। এখন এই নিঝুম নির্জন খা খা বাড়িঘর দেখে কি কেউ কল্পনা করতে পারবে – কী ভীষণ জমজমাট ছিলো এই ঘরদোর একসময়! আসার পর থেকে নানা ঝামেলায় বোঝেনি, এখন এই শূন্য স্তব্ধ বাড়িঘর তার বুকটাকেও শূন্য করে দিলো। মা বাবার অনুপস্থিতি যেন এই মুহূর্তে ভীষণ বুকে বাজলো। একটু আগেও বাবার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলো – এখন সব ভেসে গেলো, আবেগে। মনে হলো, তিনি ভালোই করেছিলেন – পৃথিবীতে অন্তত এই একটি জায়গা আছে, যেখানে এলে মা ও বাবার চিহ্ন, ফেলে আসা শৈশব কৈশোরের নানা স্মৃতিময় গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেখানে এলে মনে হবে – নিজের কাছে এলাম। যেখানে এলে মনে হবে, এখানে সবাই আছে – মা, বাবা, আপা, আপুনি, বুবু – ঠিক যেন আগের মতো। কিন্তু তারপরই তার মনে হলো – উদাসপুর অনেক বদলে গেছে। সেই ছায়া সুনিবিড় গ্রামখানির আদল আর নেই এখন। শান্তা মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করলে অঞ্জন দায়সারা গোছের উত্তর দেয়। যেমন – আশেপাশের বাড়িঘরগুলো আগে ছিলো না। এরা নদীভাঙা মানুষ, সব হারিয়ে এখানে এসে ঘর তুলেছে। কিংবা – ইছামতি দেখা যায় না, কারণ তার দু পাশেই বাড়িঘর উঠেছে; ওই আশ্রয়হীন মানুষদেরই। অথবা – হ্যাঁ, পুকুরটা প্রায় শুকিয়ে গেছে, আগের মতো বঁচুরিপানা নেই, সম্ভবত তেমন মাছও নেই। এসব বলছে ঠিকই, কিন্তু অঞ্জন ঠিক সহজ হতে পারছে না। অসংখ্য প্রশ্ন তার মনের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে আছে। উদাসপুরের সবই কি বদলে গেছে? কিছুই কি নেই আগের মতো? মানুষগুলোকে কেমন প্রাণহীন, ক্লান্ত, বিপন্ন মনে হলো তার। সবার জীবনেই কি তবে ভয়ানক কোনো সংকট ঘনিয়ে এসেছে?

বাবাকে মনে পড়লো আবার। এই গ্রামটিকে যে কী পরিমাণ ভালোবাসতেন তিনি, এখন ভাবলে অবাক লাগে। একটু আগে বাবার সমালোচনায় মুখর হয়েছিলো বলে লজ্জা হলো তার। একজন মানুষের অধিকার আছে যে কোনোভাবে জীবনযাপন করার – যদি সেটা অন্য কারো ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। বাবা নিজ গ্রামে ফিরে এসে তো কারো ক্ষতি করেননি, কোনো অন্যায়ও করেননি, বরং মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সংকট ও সমস্যায় সান্ত্বনা যুগিয়েছেন। এই বা কম কিসে? তিনি বাংলাদেশকে দেখতে চেয়েছিলেন উদাসপুরের মধ্যে দিয়ে – এই গ্রামটি ছিলো তাঁর কাছে একটি ইউনিট, ছোট এক বাংলাদেশ। বলতেন – উদাসপুরকে চিনলেই বাংলাদেশকে চেনা যাবে। তাঁর এই মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা যায়, কিন্তু অশ্রদ্ধা

প্রকাশ করা উচিত নয়। এমন কি মুক্তিযুদ্ধের মতো বিশাল একটি ঘটনাকেও তিনি ব্যাখ্যা করতে চাইতেন উদাসপুরের প্রেক্ষাপটে ফেলে। বলতেন – মুক্তিযুদ্ধকে বুঝতে চাইলে তোমাকে গ্রামে আসতে হবে। এই উদাসপুর এলে তুমি বুঝতে পারবে – কী ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, মানুষ কতটা ভালোবাসায় বাঁচিয়ে রেখেছে সেই স্মৃতিকে।

উদাসপুর আর যুদ্ধ – এ দুটো প্রসঙ্গ মনে এলে অনিবার্য ভাবে রতনের মাকে মনে পড়ে যায় অঞ্জনের। যুদ্ধের কথা মনে নেই, রতনকেও নয়। শুধু মনে আছে, বাবা একবার তাকে নিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ভাঙাচোরা ঘরে অতি যত্নে তুলে রাখা রতনের রক্তমাখা শার্ট দেখিয়ে বলেছিলেন – কেউ কি কোনোদিন পারবে রতনের মা'র কাছ থেকে ওই শার্ট কেড়ে নিতে? পারবে না। ওই মহিলা মরে যাবে তবু শার্টটি দেবে না। যুদ্ধের পুরো ব্যাপারটিই এ রকম। এ দেশের মানুষ প্রাণ দেবে, তবু সেই স্মৃতি মুছে ফেলতে দেবে না। আর যদি দ্যাখো, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বলতে কোথাও কিছু নেই, তাহলে বুঝবে আমাদের চূড়ান্ত পতন ঘটে গেছে, আরেকটি যুদ্ধ ছাড়া সেই পতন ঠেকানোর কোনো উপায় নেই।

রতন, এ গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ। বাবা তাকে একটি প্রতীকে পরিণত করেছিলেন। এক রতনকে দিয়ে তিনি সমস্ত শহীদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বকে ব্যাখ্যা করতে চাইতেন। একটি বিষয়কে এভাবে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নিয়ে যাবার এই ক্ষমতা তাঁর ছিলো।

বাবার মতো হতে পারেনি বলে অঞ্জনের এই মুহূর্তে দুঃখবোধ হলো। এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, উদাসপুরের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়া, দেশের সবকিছুতে অচেনা ছাপ দেখা – সব কিছু বিরাট ভুল হয়ে দেখা দিলো।

রাতে শুয়ে সে শান্তার কাছে আবার বাবার কথা বললো; মা'র কথা বললো – এই প্রথমবারের মতো, বিস্তৃতভাবে। রতন ও রতনের মায়ের কথা বললো, মাস্টার চাচা, আলিম ডাক্তারের গল্প করলো।

আর এই প্রথম তারা দুজনেই সচেতনভাবে একটি সন্তানের স্বপ্ন দেখলো যে একই সঙ্গে ধারণ করবে এতসবকিছু, এবং যে তার দেশ ছেড়ে, এদেশের মানুষ ছেড়ে চলে যাবে না দূর অচেনা অন্য কোনো দেশে।

১২

ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙে গেলো। এ তো শহর নয় যে, আলো অন্ধকার দুটোই কৃত্রিম হবে। ভোর হতেই এমন আলোয় ভরে গেলো সারাঘর যে, আর শুয়ে থাকা গেলো না। অঞ্জন শান্তাকে নিয়ে বাইরে বেরুলো। ভোরের শীতল হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। এই গ্রীষ্মকালেও এমন শীতল হাওয়া পাওয়া যেতে পারে, ভাবাই যায় না। হাঁটতে হাঁটতে তারা কবরস্থানের কাছে এলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শান্তাকে কবরগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো অঞ্জন। বললো,

কী অদ্ভুত, না! প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুয়ে আছে পাশাপাশি! কোথায় যেন পড়েছিলাম – *বাবা নেই মানে, দাদা ও বাবার পর এবার আমার মৃত্যুর সিরিয়াল।* আসলেই তাই, এবার আমার সিরিয়াল। আমিও এখানেই ঘুমাতে চাই – আমার মায়ের পাশে।

শান্তা চকিতে একবার অঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরলো – ওসব কথা বলো না, আমার ভয় করে।

কিন্তু এ তো অনিবার্য। সবাইকেই যেতে হবে – এটাই নিয়ম। তোমাকে তাই জানিয়ে রাখলাম – কোথায় ঘুমোতে চাই, যদি হঠাৎ কিছু ঘটে যায় – মানুষের জীবনে যে কখন কী ঘটে, বলা তো যায় না।

না না, গেলে তোমার আগে আমি যাবো। আমাকেও এখানেই রেখো – যেন তোমার পাশে থাকতে পারি।

অঞ্জন মৃদু হাসলো – আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে। দুজনেরই কথাটা জানা তো থাকলো।

বাড়ি ছেড়ে মেঠোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা বাড়ির উত্তর দিকে চলে এলো। এই পথ, এই মাঠ – আহ! অঞ্জনের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে এই ফিরে আসা। এরই মধ্যে দুচারজন করে লোকজন বেরুতে শুরু করেছে। অঞ্জন-শান্তাকে দেখে এগিয়ে এসে – বাবাজি-আম্মা, বা ভাইজান-ভাবীসাব বেড়াইতে বাইর হইলেন বুঝি – বলে কুশল বিনিময় করছে। এখান থেকে ডাক্তার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। অঞ্জন বললো,

চলো, ও বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

সেই পাগলা ডাক্তারের বাড়ি?

হ্যাঁ, আমরা তাঁকে ডাক্তার মামা ডাকতাম। খুব অদ্ভুত লোক ছিলেন। বাবার মতো তাঁর চরিত্রও রহস্যময়। ব্রিটিশ আর্মির ডাক্তার ছিলেন, কি মনে করে চাকরি ছেড়ে গ্রামে এসে বসবাস করা শুরু করেছিলেন। শহরে থাকলে হয়তো খুব পশার জমাতে পারতেন, কিন্তু কেন যে তা করলেন না, কেউ জানে না। বাবার সঙ্গে অবশ্য তাঁর একটা পার্থক্য ছিলো। ডাক্তার মামা ছিলেন অসম্ভব রাগী। তার রাগের ভয়ে ধারে কাছে ভিড়তো না কেউ, বাবা ছিলেন উল্টো – নরম স্বভাবের, তাঁর কাছে মানুষের ছিলো অবাধ যাতায়াত। মামা আবার ছিলেন অতিমাত্রায় নীতিবান – এমনই নীতিবান যে, তাঁর নিজের গরু যদি নিজেরই ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলতো, তাহলে সেটাকে ধরে খোঁয়ারে পাঠিয়ে দিতেন, তারপর রাখালকে বলতেন – তোর গাঁটের পয়সা দিয়ে আমার গরু ছাড়িয়ে আন। তাঁর যুক্তিটা ছিলো এরকম – রাখালের দায়িত্বই হচ্ছে গরু দেখে রাখা, ওর দায়িত্বের অবহেলার কারণেই আজকে সেটা গিয়ে আমার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে, কালকে অন্যেরটা করবে, তাহলে আর ওকে রেখেছি কেন? যেহেতু সে দায়িত্বে অবহেলা করেছে অতএব তাকে শাস্তি পেতে হবে। তো, উনাকে আমরা খুব ভয় পেতাম। উনার একটা বন্দুক ছিলো – সেটাই ছিলো ভয়ের মূল কারণ। উনি মাঝে মাঝেই বন্দুক বের করে বাচ্চাদের তাড়া লাগাতেন। ওই বাড়িতে লিচু গাছ আছে – একবার আপাদের সঙ্গে গেছি, ডাক্তারের একমাত্র মেয়ে শামীম আপা – আমাকে খুব আদর করতো – বললো,

যা তো খোকন, গাছ থেকে লিচু পেড়ে নিয়ে আয়।

আমি পারবো না শামীম আপা।

বেন?

মামা যদি কিছু বলেন?

আরে না, বাবা কি বলবেন?

যদি বন্দুক নিয়ে মারতে আসেন?

দুর পাগল, তোকে বাবা মারতে পারেন?

তো, কথা হচ্ছিলো উঠোনে দাঁড়িয়ে, ঘরেই মামা, শুনেছেন নিশ্চয়ই। তখন কিছুই বললেন না, যে-ই না গাছে উঠেছি, অমনিবারে হুংকার দিয়ে উঠলেন – অ্যাই নিচু গাছে কে রে, বন্দুক নিয়ে এলাম কিন্তু।

ওই হুংকার শুনে কি আর গাছে বসে থাকা যায়, কোনো মতে নেমে একছুটে বাড়ি। হা হা হা। এখন মনে পড়লে খুব হাসি পায়। ওটা যে তিনি মজা করার জন্য করতেন, তখন তো আর বুঝতাম না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তিনি, এজন্য পরিণামও ভোগ করতে হয়েছিলো তাঁকে। পাকিস্তান আর্মিরা এসে তাঁর পুরো বাড়িটাই পুড়িয়ে দিয়েছিলো। অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, সেই পোড়া টিন দিয়েই তিনি ঘর তুলেছিলেন আবার। এই ঘর নাকি এখনো আছে। সারাজীবন তিনি সেই স্মৃতি সংরক্ষণ করে গেছেন। তাঁর তো কোনো অভাব ছিলো না, ইচ্ছে করলেই নতুন করে বাড়ি করতে পারতেন।

বলতে বলতে তারা বাড়ির সীমানায় এসে পড়লে চোখে পড়ে – পুড়ে লাল হয়ে যাওয়া টিনগুলো প্রায় জুড়ুর হয়ে গেছে – তবু বদলানো হয়নি। এ বাড়িটাও বিরাট – অঞ্জনদের বাড়ির মতো। অন্দর মহলটা ভেতরের দিকে, বাইরেও বিরাট জায়গা। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোড়ন পড়ে গেলো। রাখালগুলো দৌড়ে এসে টিপটিপ সালাম করছে – হাঁপাচ্ছে, বলছে – ভাইজান, আপনে, আপনে আইছেন! – তারপর আম্মা, বুবু এই সব ডাক ছেড়ে ভেতরের দিকে ছুটছে। দেখতে না দেখতে শামীম আপাও দৌড়ে এলো।

খোকা তুই!

অঞ্জন মৃদু হাসে – হ্যাঁ, শামীম আপা, চলে এলাম।

খোকা, খোকা, সত্যি তুই এসেছিস!

হ্যাঁ তো।

শামীম আপার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। এসে গাল ছুঁয়ে, চুল ছুঁয়ে আদর করছে, যেন অঞ্জনের বয়স একলাফে ২০ বছর কমে গেছে – আর পাগলের মতো বলছে – এতদিন পরে এলি ভাই। কতদিন পর! এই বোনটাকে বুঝি আর মনেও পড়ে না! আমার নিজের তো কোনো ভাইবোন নেই, তোরাই ছিলি সব, অথচ সে কথা তোরা বেমালুম ভুলে গেছিস!

অঞ্জন বিব্রত হয়ে চুপ করে ছিলো। সে শামীম আপার কাছে সত্যি এমন আবেগপ্রবণ অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেনি। আপা, আপুনি বা বুবুর মতো শামীম আপাও তার একটা বোন – একথা কখনো তার মনেই হয়নি। মনে না হওয়ার পেছনে কারণও আছে। ছোটবেলায় শামীম আপার কাছে আদর পেয়েছে, আহ্লাদ পেয়েছে,

অপ্রত্যাশিত অনেক প্রশ্রয়ও পেয়েছে, সত্যি – কিন্তু তবু ও বাড়ির সঙ্গে একটা দূরত্ব ছিলো তার। সেটার কারণ বোধ হয় ডাক্তার মামা-ই – যার ভয়ে যখন তখন ও বাড়িতে ঢুকে পড়ার সাহস হতো না, আসতে হতো বোনদের সঙ্গে, ফলে শামীম আপার সঙ্গে গভীর কোনো সম্পর্কের বোধ কাজ করেনি কখনো।

আর এখন দ্যাখো, কী অদ্ভুত, শামীম আপা তাকে পেয়ে কাঁদছে। পৃথিবীর কোথায় কার জন্য কী যে সঞ্চিত থাকে, কেউ তা জানে না। সে-ও কি জানতো, এই কিছুক্ষণ আগেও, যে, এই বাড়িতে তার জন্য কেউ সঞ্চয় করে রেখেছে আবেগময় স্নেহের ভাণ্ডার!

অঞ্জন চুপ করে দাঁড়িয়ছিলো। শান্তাও । সে বুঝতেই পারছে না, তার এখন কী করা উচিত! অঞ্জনও তাকে এই মহিলা সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেনি। ডাক্তার মামার একটাই মাত্র মেয়ে – আমাকে খুব আদর করতো – এটুকুই। কিন্তু অঞ্জনরা যে তার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্বন্ধে কিছুই বলেনি।

কিছুক্ষণ এ রকম চলার পর শামীম আপা চোখ মুছে নিয়ে বলে – তোর বউ বুঝি?

হ্যাঁ, ও শান্তা।

বাহ্, খুব সুন্দর তো রে তোর বউটা। এসো বউ, ভেতরে চলো – বলে, হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতে যেতে বলে – কালকেই খবর পেয়েছি, তোরা এসেছিস, কিন্তু বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, তারপর আবার এই কাণ্ডকারখানা ভোরে এখানে এসে হাজির হবি ভাবতেই পারি নি – তাই অমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম, বউ তুমি যেন কিছু মনে করো না আবার।

ভেতরে গিয়ে শামীম আপা খুটিয়ে খুটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করে। অঞ্জনের বোনদের কথা, তাদের ছেলেমেয়েদের কথা, অঞ্জনের দেশে ফেরার কথা, বিয়ের কথা। কিন্তু নিজের কথা কিছুই বলতে চায় না। অঞ্জন একবার দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করে,

দুলাভাইকে দেখছি না যে।

ঘুমোচ্ছে – এক বাক্যে ওই প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। অঞ্জন এর কারণ বোঝে। শামীম আপার বিয়ে হয়েছিলো খুব বাজে ভাবে। ডাক্তার মামা ভিলেজ পলিটিক্সের শিকার হয়েছিলেন। ঠিক কী যে ঘটেছিলো – অঞ্জন তা জানে না, কিন্তু মনে পড়ে, একদিন সকালে হঠাৎ শুনেছিলো – কাল রাতে শামীম আপার বিয়ে হয়ে গেছে। বরকে কারোরই পছন্দ হয়নি। কোনোদিক থেকেই সে শামীম আপার যোগ্য ছিলো না। অশিক্ষিত, অমার্জিত এরকম একজন লোকের সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের মেয়ের বিয়ে হতে পারে, এটা কেউ কল্পনাও করেনি। মনে পড়ে, এই ঘটনার পর আব্বা ডাক্তার মামাকে ডেকে নিয়ে খুব ধমকেছিলেন – কিন্তু যা ঘটে গেছে তা তো আর ফেরাবার উপায় নেই। এই গ্লানি ও বেদনা থেকে বাপ-মেয়ে কেউই কোনোদিন মুক্তি পেলো না।

অঞ্জন জিজ্ঞেস করে – গ্রামের অবস্থা কি শামীম আপা? মনে হলো সব কেমন যেন বদলে গেছে!

তা গেছে। উদাসপুর তো এখন অভিভাবকহীন। কৃপা তো শুধু উদাসপুরেরই নয়, পুরো অঞ্চলেরই অভিভাবক ছিলেন। এমন কি বাবাও পৃথিবীতে সম্ভবত একমাত্র কৃপাকেই কেয়ার করতেন, ভয় পেতেন। তো, তিনি

মারা যাওয়ার পর সব কিছু যেন কেমন ওলোট পালোট হয়ে গেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে যাঁরা ম্লান ছিলো – যারা কখনো নিজেদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতেই পারেনি – তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নানান গ্রুপে ভাগ হয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতি ার জন্য যা ইচ্ছে তা-ই করে বেড়াচ্ছে। অবস্থা খুব ভালো নয় রে খোকা।

অঞ্জন চুপ করে থাকে। অবস্থা ঠিক কতটা খারাপ – সে কথা বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না, বরং অন্য প্রসঙ্গ তোলে,

এই পোড়া টিনগুলো এখনও রেখে দিয়েছো শামীম আপা? ভেঙে পড়ছে তো! এগুলো বদলিয়ে নতুন টিন লাগাতে পারো না?

না রে। ইচ্ছে করেই বদলাই না। বাবা এত যত্ন করে এসব স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করেছিলেন, আমি কি করে সেগুলো ফেলে দেই বল! থাক না, যত দিন থাকে!

আসার সময় শামীম আপা বলে – এখন যেহেতু দেশেই আছিস, মাঝে মাঝে সময় করে আসিস। এখানকার মানুষ এত প্রত্যাশা করে তোদেরকে নিয়ে, তোর তো একটা দায়িত্বও আছে। দু-চারদিন থাকলেই বুঝতে পারবি – এখানকার অবস্থা কত খারাপ, তুই মাঝে মাঝে এলে পরিস্থিতি হয়তো পাল্টাতেও পারে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেলো। শামীম আপা নাস্তা না খাইয়ে ছাড়লো না কিছুতেই। বাড়িতে ফুলুও নাস্তা বানিয়েছেন – সেটাও খেতে হলো। বোঝা যাচ্ছে, এখানে কয়েকদিন থাকলে দ্বিগুণ হয়ে ঢাকায় ফিরতে হবে! ততক্ষণে আবার লোকজন আসতে শুরু করেছে। একদল তরুণ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। জিজ্ঞেস করে জানা গেলো – ওরা স্থানীয় কলেজের ছাত্র, অঞ্জনের নাম শুনে শুনে বড় হয়েছে, এবার কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে – তাই এসেছে। অঞ্জন প্রাণখোলা হাসিতে সবাইকে সহজ করে তোলে, নানা আলাপচারিতায় মেতে ওঠে – যেমন,

এখানে তো আগে কলেজই ছিলো না, স্কুল পাশ করে হয় ঢাকায়, না হয় মানিকগঞ্জ শহরে পড়তে যেতে হতো। এখন তোমাদের কত সুবিধা – বাড়িতে থেকেই পড়তে পারছো।

কিংবা –

স্কুলের কি অবস্থা? স্যাররা কেমন আছেন?

তরুণরা জানালো – পুরনো স্যারদের মধ্যে দু-জন মাত্র আছেন।

কেন?

স্কুলটা সরকারী হওয়ার পরে অনেকেই বদলি হয়ে গেছেন, কেউ অবসর নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ মারা গেছেন।

মারা গেছেন? কে?

আমাদের প্রাক্তন হেড স্যার, শামসু স্যার, সাত্তার স্যার, নাসির স্যার, কামাল স্যার – সবাই মারা গেছেন। এখন আছেন শুধু হরিপদ স্যার আর মনিষ স্যার। আর সব নতুন, বদলি হয়ে আসা টিচার।

এতজন স্যার মারা গেছেন শুনে অঞ্জনের ভারি খারাপ লাগলো। এঁদের কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ পেয়েছে সে। বিশেষ করে শামসু স্যার আর হরিপদ স্যারের কথা খুব মনে পড়ে। শামসু স্যার অংকের শিক্ষক ছিলেন, বলতেন – অংক হচ্ছে লজিকের ব্যাপার। তোর লজিক যত পরিষ্কার হবে, অংকও তত সহজ মনে হবে। – অংকের প্যাঁচগুলো তিনি এত চমৎকারভাবে ধরিয়ে দিতেন যে, অঞ্জনের একসময় মনে হতো, পৃথিবীর কোনো অংকই এখন আর তার কাছে কঠিন মনে হবে না। হরিপদ স্যার ছিলেন একইসঙ্গে ইংলিশ গ্রামার আর বাংলা ব্যাকরণের পন্ডিত। অঞ্জনের মনে হয় – এই স্যারের শেখানো ইংলিশটাই সে এখনো ভাঙিয়ে খাচ্ছে। অবশ্য স্যারের উৎসাহ ছিলো আরো অনেক দিকেই। ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিতেন, বই পড়তে বলতেন, লিখতে বলতেন।

তরুণদের সঙ্গে এইসব নানারকম আলাপের এক পর্যায়ে ওদের তরফ থেকে অভিযোগ শোনা যায় – ভাইজান তো আর আমাদের খোঁজখবর রাখছেন না, এদিকে এই অঞ্চলে মৌলবাদীরা সংগঠিত হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি তাদের প্রতিহত করতে। এ ব্যাপারে কিন্তু আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে আমরা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেবো না, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে কিছুতেই নস্যাৎ করতে দেবো না। এ জন্য এখন দরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির একত্রিত হওয়ার – আমরা চাই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

অঞ্জনের খুব ভালো লাগে। না, অতটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তরুণরা সচেতন হয়ে উঠছে – যদিও সে প্রকৃত অবস্থা জানে না, যদি সত্যি মৌলবাদী কর্মকাণ্ড চলতেও থাকে, তবু – এরা সেটাকে ঠেকিয়ে দিতে পারবে। এরাই তো এদেশের ভবিষ্যত – এই প্রজন্মের জন্মই হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে, এদের চিন্তাভাবনাও তাই পরিষ্কার। ওদের চিন্তাভাবনা আরো পরিষ্কারভাবে জানার জন্যই হয়ত অঞ্জন ওদেরকে মুক্তিযুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করে। বলে,

আচ্ছা, আমাদের যুদ্ধটা কেন হয়েছিলো বলে তোমাদের ধারণা?

উত্তর আসে – জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭-ই মার্চ স্বাধীনতার ডাক দেন। ওই ডাকেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো।

ওই ডাকেই? শুধুমাত্র ওই ডাকেই? তার পেছনে আর কোনো ইতিহাস নেই? অন্য কোনো কারণ, অন্য কোনো প্রেরণা বা স্বপ্ন ছিলো না এই যুদ্ধের পেছনে?

হয়তো ছিলো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু না থাকলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না।

মানছি সে কথা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে – যুদ্ধটা কেন হয়েছিলো? মানুষ কোন আকাঙ্ক্ষা থেকে যুদ্ধটা করেছিলো? বাঙালি তো একটা নিরীহ জাতি, কি এমন প্রত্যাশা ছিলো তাদের যে এমন মরনপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো?

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তোমাদের যার যা কিছু আছে ...

শুধু এ জন্যই? বঙ্গবন্ধু বলেছেন বলেই এতগুলো লোক প্রাণ দিয়েছে? জনগণের নিজস্ব কোনো প্রত্যাশাই ছিলো না?

ছিলো, তারা চেয়েছিলো দেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন...

বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন, তারপর?

তারপর আর কি? বঙ্গবন্ধু তো বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা....

অঞ্জন ক্লান্ত বোধ করে। এই ছেলেগুলো প্রতিটি বাক্যে একবার করে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করছে, যেন তা না করলেই নয়। এরা তাহলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বলতে একজন ব্যক্তিকেই বোঝে! স্বাধীনতা মানে তাহলে তাঁর আদেশ-নির্দেশ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি? এদের কথা শুনে কে বলবে – যুদ্ধে এতগুলো মানুষ প্রাণ দিয়েছে একজন মাত্র মানুষের জন্য নয়, একটি ধ্রুপদি স্বপ্নের জন্য – ভালো ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। এমনকি এই ছেলেগুলো যদি একবারও বলতো – বঙ্গবন্ধু তো একটি শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন, জনগণও তাঁর কাছ থেকে সেই স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলো, আর সেজন্যই, তাঁর ডাকে এমন বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলো – তবুও মানানসই হতো। অঞ্জনের ধারণা হলো – এরা শেখ মুজিবের নামটি ছাড়া আর কিছুই জানে না। এমন কি, তিনি যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত শোষণহীন সমাজের কথা বলতেন – এই কথাটিও এদের অজানা ।

অঞ্জনের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একটু চড়া গলায়ই সে বোঝানোর চেষ্টা করে – যুদ্ধটা একজন মাত্র ব্যক্তির জন্য হয়নি। .... ছেলেরা বিরস মুখে শোনে, বেন্ড বেন্ড উসখুস করে এবং অচিরেই উঠে দাঁড়ায় – আমরা তাহলে এখন যাই ভাইজান। কিন্তু যেতে যেতে তাদের অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর ভেসে আসে – বঙ্গবন্ধুর কথা শুনবার পারে না, শালায় রাজাকার। ওর বাপ-দাদা আছিলো রাজাকার, ও আর কি হইবো? ব্যাপ্টেন হালিমও রাজাকার, নইলে কি আর এই বাড়িতে আইসা ক্যাম্প ফালায়? জিয়া আর এরশাদের পাও ধইরা মন্ত্রী অয়! রাজাকার শালায় আবার আমাগো মুক্তিযুদ্ধ শিখায় ...

একদল যেতে না যেতে আরেকদল এসে হাজির হয়। এরাও অঞ্জনকে দেখতে এসেছে – অঞ্জনের কথা শুনতে এসেছে। কিন্তু অঞ্জনের কোনো কথা শোনার আগে নিজেরাই পূর্ববর্তী তরুণদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়ে দেয় – ওরা নিশ্চয়ই আপনার কান ভারি করে গেলো! ওদের কথায় কান দেবেন না ভাইজান। ওরা আসলে সন্ত্রাসী। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি করে বেড়ায়। কারণে অকারণে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ায়, আর বেন্ড এসবের প্রতিবাদ করলে তাদেরকে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র, রাজাকার বলে গালাগালি করে। আবার যখন কোনো রাজাকারকে আওয়ামী লীগ থেকে ইলেকশনে নমিনেশন দেওয়া হয়, তখন তাকে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দিয়ে তার পক্ষে কোমর বেঁধে কাজ করে। গত ইলেকশনে যখন বিচারপতি নুরুল ইসলামকে নমিনেশন দেয়া হলো, তখন এরাই এই বিখ্যাত রাজাকারের জন্য জান বাজি রেখে, সন্ত্রাস করে, ভয় ভীতি দেখিয়ে একটা অরাজক অবস্থা তৈরী করলো।

বিচারপতি নুরুল ইসলাম নামটি শুনেই অঞ্জনের খটকা লেগেছিলো। জিজ্ঞেস করে জানলো – হ্যাঁ, এ সেই বিচারপতি নুরুল ইসলাম, জিয়ার আমলে সি.ই.সি ছিলেন, এরশাদের আমলে প্রথমে আইনমন্ত্রী, পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এই লোকটি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে

জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন দেশে এই বলে ব্যাখ্যান করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিচ্ছিন্নতাবাদী কতিপয় দুষ্কৃতিকারিকে দমন করা হয়েছে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শান্ত। দেশের মানুষ যখন মরনপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে, অগুনিত নারী ধর্ষিত হচ্ছে, সংখ্যাহীন মানুষ নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে; তখন যে লোকটি বলে বেড়ায়, দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক – সেই লোক শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি নামধারি দল আওয়ামী লীগের নমিনেশন পেলো! আশ্চর্য!

তাহলেই বুঝুন।

কিন্তু এরা কারা? অঞ্জনের বৌতূহল হলো। এত যে সোচ্চার কণ্ঠস্বর, এরাও রাজনীতি ফাজনীতি করে নাকি? অঞ্জন জিজ্ঞেস করলো – তা, মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে তোমাদের ভাবনাটা শুনি। কেন হয়েছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ?

আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার ভাইজান। মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের ভূমিকা যে কী, আমরা তা সত্যিই বুঝি না। যুদ্ধ শুরু হতে না হতে উনি তো যেচে পড়ে পাকিস্তান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ঐ সময় যদি শহীদ জিয়া স্বাধীনতার ঘোষনা না দিতেন, তাহলে কি এ দেশ স্বাধীন হতো, আপনিই বলেন?

এটা কিন্তু কোনো প্রশ্ন নয়। ইতিহাসে যার যা ভূমিকা তা নির্ধারিত হয়েই আছে। সেটা নিয়ে বিতর্ক না করে আমাদের বোঝা দরকার – যুদ্ধের কারণটি কি ছিলো? এদেশের মানুষ কেন এমন প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো?

শহীদ জিয়ার ঘোষনা শুনেই...

তা তো বুঝলাম, কিন্তু যুদ্ধটা হলো কেন? কোন প্রেরণা থেকে? আমাদের রতনের কথাই ধর। সে তো আর জিয়ার ঘোষনা শুনে যুদ্ধে যায়নি। তাহলে কেন গিয়েছিলো? কোন স্বপ্ন থেকে?

সেই স্বপ্নের কথাই তো আমাদের দেশনেত্রী বলেন। শহীদ জিয়ার স্বপ্ন সফল না হলে এদেশের কোনো ভবিষ্যত নেই ভাইজান।

আমি কিন্তু তোমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে চেয়েছি – দেশনেত্রী কী বলেন সেটা নয়। আর না হয় শহীদ জিয়ার স্বপ্নটা কি ছিলো সেটাই আমাকে বুঝিয়ে বলো।

তারা এবার আর কোনো কথা বলে না। অচিরেই ছেলেরা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং যেতে যেতে দুর থেকে শুনিয়ে যায় – এদ্দিন বিদেশে থাইকা অ্যাহন আইছে মুক্তিযুদ্ধ মারাইবার লাইগা। চুতমারানি। এ শালায়ও আওয়ামী লীগের দালাল। বাপ চাচারা খামাখাই এগো নিয়া ফালাফালি করে।

অঞ্জনের মন খারাপ হয়ে যায়। তরুণরা তাহলে মুক্তিযুদ্ধ বলতে ব্যক্তিকে বোঝে। আশ্চর্য! না, অবস্থা সত্যি খারাপ। পরিস্থিতি সত্যি পাল্টে গেছে। এই ছেলেগুলো কী অবলীলায় তাকে তার বাপ দাদা তুলে গালাগালি করে গেলো! অথচ বয়স্ক মানুষগুলোর ব্যবহার দেখে মনে হয় – এখনো তারা কত ঋণী হয়ে আছে। না, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এ সবের বালাই নেই। অঞ্জনের উপলব্ধি ঘটে যায় – তাদের ঐতিহ্যবাহী অবস্থানটি টলে যেতে শুরু করেছে। তার খারাপ লাগে। সে না হয় এই গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার পুর্বপুরুষরা তো

সত্যি খুব ভালোবাসতেন ওদের! ছেলেগুলো তাঁদেরকে পর্যন্ত গালাগালি করে গেলো – তাদের অপরাধটা কি? অঞ্জন প্রায় মুষড়ে পড়ে।

কিন্তু শান্তা এসবের মধ্যে নেই। সে বেশ মেতে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। গ্রামের মহিলারা জড়ো হয়েছে তাকে ঘিরে আর সে হাত নেড়ে নেড়ে, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গল্প করছে। করুক। দৃশ্যটা ভারি সুন্দর লাগে অঞ্জনের কাছে। শান্তাকে আর না ডেকে সে একাই এদিকে ওদিকে হেঁটে বেড়ায়, কবরের কাছ গিয়ে নিঝুম হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

দুপুরের দিকে সাইকেলের ঘন্টাধ্বনি আর চেনা গলার ডাক শোনা যায়।

অঞ্জন, অঞ্জন।

হরিপদ স্যার। অঞ্জন দৌড়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করে,

স্যার আপনি? এই রোদের মধ্যে কষ্ট করে এসেছেন। আমিই তো যেতাম দেখা করতে! আসলে সবগলেই আমার যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এত লোকজন আসছে ...

আরে তুই এত বিব্রত হচ্ছিস কেন? আমি এসেছি তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে? তুই এসেছিস শুনে আর থাকতে পারলাম না রে বাবা। ভাবলাম, এতদিন পর এসেছিস, একটাবার দেখে আসি।

আসুন স্যার, ভেতরে আসুন।

তিনি ভেতরে এলে, আর অঞ্জনের ডাক শুনে ও স্যারের পরিচয় পেয়ে শান্তা এসে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলে তিনি যেন একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। তার চোখে পানি দেখে সেটা বোঝা গেলো। বললেন,

সুখে থাকো মা, সুখে থাকো। তুমি তো সৌভাগ্যবতী – অঞ্জনকে পেয়েছো, ও যে আমাদের নক্ষত্র।

অঞ্জন লজ্জা পেলো – কী যে বলেন স্যার।

তুই চুপ থাক। – নক্ষত্রকে ধমক লাগিয়ে তিনি শান্তাকেই বলতে লাগলেন – আমাদের স্কুলটার বয়স ৯০ বছর। কত হাজার ছাত্র-ছাত্রী যে এখানে পড়াশোনা করেছে, তারপর সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে তার কোনো হিসেব নেই। কিন্তু এই ৯০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্রটির নাম – অঞ্জন হায়দার চৌধুরী। আমাদের বড়ো গর্ব ওকে নিয়ে।

অঞ্জন কথা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করে,

এখানে নাকি কলেজ হয়েছে স্যার, শুনলাম?

হ্যাঁ, সে তো অনেক দিন আগের কথা। তুই আমেরিকা যাবার পরপরই তো হলো। বিচারপতি নুরুল ইসলাম কলেজ।

বিচারপতি নুরুল ইসলাম কলেজ? কেন? কলেজটা ওনার নামে হলো কেন?

কেন আবার! ও অঞ্চলে কলেজের দাবি অনেক দিনের। তিনি সেই দাবি পুরণ করেছেন, আর তো কেউ করেননি। তাই নিজের নামেই ...

তাই বলে উনার নামে কলেজ? বেন্ড প্রতিবাদ করলো না? আপনারাও কিছু বলেননি?

আমরা বলার কে রে বাবা? এটা তো একটা রাজনৈতিক ব্যাপার, প্রতিবাদ করলে অন্তত রাজনৈতিকভাবেই তার শুরুটা হওয়া উচিত ছিলো, তা তো আর হয়নি। আর হবেই বা কেন বল, এগুলো যে সব বড় মানুষদের কাজ, রাজনীতির রাঘব বোয়ালদের কাজ, তারা তো সব একই চরিত্রের, এ জন্যই এরকটা হয়ে আছে। সাধারণ মানুষ কি অত সহজে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ করার সাহস পায়? আমরা চুনোপুটিরা কথা বলবোই বা কোন সাহসে?

তাই বলে বিনা প্রতিবাদে তার নামে এখানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে? যে লোকটি মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের বিরুদ্ধে...

হ্যাঁ, আমরা সবাই জানি সে কথা। কিন্তু বেন্ড সেটা মনে রাখেনি, সবাই-ই ভুলে গেছে। আর না ভুলে উপায় কি? এলাকার একজন মন্ত্রী, ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন একসময়, – তাকে একটু হাতে রাখতে হবে না? খামোখা ওসব কথা তুলে লাভ কি? আর তাছাড়া তিনি তো এখন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছেন? বুঝলাম না স্যার। একজন রাজাকার আবার নতুন করে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায় কিভাবে?

যায়, যেতে পারে রে বাপ। তুই তো অনেক দিন দেশের বাইরে, ফিরেও সম্ভবত রাজনীতির হালচাল বোঝার চেষ্টা করিসনি, তাই কিছু জানিস না, বুঝিস না। উনি আওয়ামী লীগে জয়েন করেছেন না! এখন আওয়ামী লীগে একজন রাজাকার জয়েন করলেও সে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায়। এমন কি গোলাম আযমও এসে যদি আওয়ামী লীগে জয়েন করে, তাহলে তার মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার অনেক প্রমাণ হাজির করবে এই আওয়ামী লীগই, যেমন করেছিলো এই জাস্টিস সাহেব সম্বন্ধে। ১৯৯৬ সালে তো তাকে এখান থেকে আওয়ামী লীগের নমিনেশন দেয়া হয়েছিলো, তখন এই দলের নেতাকর্মীরাই প্রচার করেছে – তিনি নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডক্রসের থেকে প্রচুর অনুদান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। অথচ এই লোকটিই যখন এর আগে জাতীয় পার্টি থেকে ইলেকশন করেছিলো, তখন এই সব নেতাকর্মীরা তাকে রাজাকার বলে গালি দিয়ে, তার বিরুদ্ধে পোস্টার, লিফলেট ছাপিয়ে তাকে প্রতিহত করার ঘোষনা দিয়েছিলো। তাহলেই বুঝে দ্যাখ, কীভাবে রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যাচ্ছে। আবার ক্যাপ্টেন হালিমের মতো মহান, বীর মুক্তিযোদ্ধাও রাজাকার বলে গালি শুনছে – কারণ তিনি কখনো আওয়ামী রাজনীতি করেননি।

অঞ্জন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। স্যারই প্রসঙ্গ পাল্টান।

এসব কথা বরং থাক রে অঞ্জন। এসব নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। রাজনীতির কোনো চরিত্র নেই এখন, এদেশে। আমরা এ নিয়ে ভেবেই বা কি করবো? তারচেয়ে বরং তোর কথা বল। ক দিন থাকবি এখানে?

কিছু ঠিক করে আসিনি স্যার। যে ক দিন ভালো লাগে, থাকবো।

স্কুলে যাবি তো?

হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই যাবো। কালই যাবো। শুনেছি অনেক স্যারই এখন আর নেই। খুব খারাপ লাগছে শুনে। স্কুলটা এখনো আমাকে খুব টানে স্যার।

আসিস বাবা। এখনও আমরা তোর কথা বলি।

আচ্ছা স্যার, ওই কলেজে পড়াশোনা কেমন হয়? টিচাররা কি স্থানীয়? – অঞ্জন যেন কলেজের প্রসঙ্গটি ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

সে আর বলিস না বাবা। সারা দেশে যা হচ্ছে, এখানেও তাই-ই হয়। আগে মনে হতো – এখানে একটা কলেজের খুব প্রয়োজন। কত স্বপ্ন ছিলো – যাদের শহরে গিয়ে পড়ার সামর্থ্য নেই তারাও পড়াশোনা করতে পারবে, এখানকার মানুষগুলো শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এখন মনে হয়, কলেজটাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। কচি কচি ছেলেগুলো কলেজে গিয়েই নেতা বনে যায়। আমাদেরই ছাত্র আমাদের সামনে সিগারেট খায়, স্কুলের মেয়েগুলোকে উত্ত্যক্ত করে, দোকানপাট, হাটবাজারে গিয়ে চাঁদাবাজি করে, মিছিল মিটিং করে, মারামারি করে। পড়াশোনা করার সময় কোথায় ওদের? রাজনৈতিক নেতারাও এদের প্রশ্রয় দেয়, ফলে আর কারো কথা ওরা শোনে না। না মা-বাবা, না শিক্ষক, না আর কোনো গুরুজন। কলেজটার জন্য ছেলেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছেরে অঞ্জন। বড়ো কষ্ট হয়, বড়ো কষ্ট।

স্যারের দুঃখিত ও বিবর্ণ মুখ দেখে অঞ্জনেরও খুব কষ্ট হলো। এ বিষয়টা তাই থামিয়ে দিয়ে আবার স্কুলের প্রসঙ্গেই ফিরে এলো সে। জিজ্ঞেস করলো নতুন শিক্ষকদের কথা, তারা কোত্থেকে এসেছে, এসে মানিয়ে নিতে পারছে কী না ইত্যাদি।

কথায় কথায় স্যারও তুললেন বাবার কথা, বললেন,

তোর বাবার মতো একজন মানুষের বড়ো প্রয়োজন আমাদের। তিনি ছিলেন আমাদের বিবেকের মতো। যে কোনো বিষয়েই তিনি ছিলেন আমাদের ভরসা, আমাদের আশ্রয়; আমরা সব বিষয়ে তাঁর পরামর্শ মেনেই কাজ করেছি বরাবর। এই অভিভাবকত্ব তিনি জোর করে নেননি, এ অঞ্চলের মানুষই তাঁকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে অভিভাবকের আসনে বসিয়েছিলো। তিনি চলে যাবার পরই কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেলো সব। ...

এসব কথা অঞ্জন আগেও শুনেছে, কিন্তু কোন ধরনের সমস্যাগুলো বাবা কীভাবে সমাধান করতেন, আর কেনই বা লোকজন তাঁকে অভিভাবকের আসনে বসিয়েছিলো, সেটা তার কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়।

বিদায় নেয়ার সময় স্যারও বলে গেলেন, তুই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকিস না অঞ্জন। এই দুর্দিনে তোরও অনেক দায়িত্ব।

কিন্তু, সে কি দায়িত্ব পালন করবে? তার পিতা, পিতামহ বা প্রপিতামহের জন্য সময়টি ছিলো তাঁদের অনুকূলে। যেমন দাদা তাঁর বাবার প্রবল প্রতিপত্তি থাকতে থাকতেই নিজের আসন পাকা করে ফেলেছিলেন, আবার বাবাও দাদার প্রভাব প্রতিপত্তি থাকতে থাকতেই এখানে এসে নিজের জায়গা তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। স্থানীয় মানুষ একজনের পর আরেকজনকে পেয়ে গেছে – এমনকি একই সঙ্গে দু জনকেও পেয়েছে কিছু সময়ের জন্য। ফলে অনিবার্য ধারাবাহিকতায় তারা এঁদেরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছে।

মাঝখানে কোনো সময়ের ব্যবধানই ছিলো না। অন্য কেউ প্রভাব সৃষ্টি করে দাঁড়াবার সময় কিংবা সুযোগ কোনোটাই পায়নি। এমন কি ডাক্তার মামার মতো লোকও বাবার প্রভাবের কাছে ম্লানই ছিলেন বলা যায়। কিন্তু অঞ্জনের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটি সে রকম নয়। বাবার মৃত্যুর পর প্রায় ১৪/১৫ বছরের ব্যবধানে সে প্রথমবারের মতো এখানে এলো। মাঝখানের এই সময়টুকুতে স্বাভাবিক ভাবেই শূন্যস্থান শূন্য থাকেনি। হয়তো অভিভাবকের জায়গাটি কেউ পায়নি, কিন্তু প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে অনেকেই। তারা অঞ্জনের কথা শুনবে কেন? অঞ্জনকে মেনে নেয়া দুরে থাক, নিজেদের প্রভাব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বরং তাকে প্রতিহত করতে চাইবে। না, তার কিছুই করার নেই। সে এমন যুদ্ধে নামতে পারবে না। কিন্তু তার প্রতি মানুষের এই অদ্ভুত প্রত্যাশা তাকে কষ্ট দিচ্ছে। আবারও মনে হলো – এতদিন এই বাইরে থেকে জীবনে বড়ো ভুল হয়ে গেছে। অভিভাবকত্বের লোভ তার নেই, কিন্তু মানুষের কোনো প্রত্যাশাই সে পুরণ করতে পারে না – এই অক্ষমতার বোধ বড়ো পীড়াদায়ক। তার পুর্বপুরুষরা যেভাবে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের জন্য – অন্তত সে সেরকমই শুনেছে – সেই ধারাবাহিকতায় সে এক ভয়ংকর ছেদবিন্দু। ধারাবাহিক ঐতিহ্যের রেখা ওই ছেদবিন্দু থেকে অন্যদিকে বেঁকে ছাপোষা-আত্মকেন্দ্রিক জীবনের দিকে চলে গেছে। সে তাই নিছক গন্ডিবদ্ধ ছাপোষা জীবন যাপন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

১৩

অঞ্জনের মন খারাপ ছিলো, তবু শান্তার উৎসাহে বিকেলে ওকে নিয়ে পদ্মার পাড়ে যেতে হলো। এখনও পদ্মা শান্তই– জোয়ার আসেনি এখনো, এলে রূপ পাল্টে যাবে। পানি ঘোলা হবে, স্রোত তীব্র হবে, ঘুর্ণি তৈরি হবে আর রেগেমেগে কাছে পাওয়া বাড়ি-ঘর-জমি-জমা সব ভেঙে নেয়া শুরু করবে সে। সেই রুদ্র রূপের কথা এখন কল্পনাই করা যায় না।

বিকেলের পড়ন্ত নরম রোদের ভেতর, শীতল ঝিরঝিরে হাওয়ার ভেতর, মৃদুমন্দ ঢেউ দেখতে দেখতে অঞ্জন আর শান্তা হেঁটে বেড়ালো অনেকক্ষণ, অনেক দুর পর্যন্ত। চারপাশের কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা কখনো হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, কখনো দুষ্টুমি করে পানি ছিটালো পরস্পরকে, কখনো একটু দৌড় প্র্যাকটিস করলো। তারপর দেখতে দেখতে বিকেলের আলো মুছে গিয়ে সন্ধ্যার রহস্যময় আলো ফুটলো আকাশ জুড়ে। বিরাট সুর্যটা লাল রঙে নিজে রঞ্জিত হয়ে আর আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে ডুব দিলো পদ্মার ভেতরে। আর তখন, পদ্মা নিজেই হয়ে উঠলো দারুণ রহস্যময়ী আর রূপসী। না, এই দৃশ্য কোনো অংশেই কক্সবাজারের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয় – বরং খানিকটা বেশিই, মনে হলো শান্তার। ওখানে এই রহস্যময়তার ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায় মানুষের কোলাহলে – এখানে সবকিছুই কেমন নির্জন হয়ে আছে এই মুহুর্তে। যে মানুষটির জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে এই সব দৃশ্য দেখে – কী করে তার ভালো লাগবে পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গা? শান্তারও মনে হলো– এই সবকিছুর জন্য অন্য সবকিছু ছেড়ে এখানেই কাটিয়ে

দেয়া যায় সারাটি জীবন। কী অসামান্য হয়ে উঠেছে পদ্মার রূপ, দু-একটি নৌকা ধীরে অলস ভঙ্গিতে তীরে ফিরছে, অসংখ্য পাখি ফিরছে ঘরে; উদাসপুরের আকাশ বাতাস জুড়ে নেমেছে গভীর উদাসীনতা, আর সবগুলো মানুষ যেন শীতের সকালের রোদের মতো, বা পূর্ণিমা রাতের জোসনার মতো সেই উদাসীনতা গায়ে চোখে মুখে মেখে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। পুরো প্রকৃতিই যেন বলে দিচ্ছে – এবার বাড়ি ফেরার সময় হলো। শান্তার মনে হলো – জীবনে কখনো এমন ঘরে ফেরার ইঙ্গিত সে দেখেনি সারা প্রকৃতি জুড়ে। এতক্ষণের উচ্ছলতা, আনন্দ সব যেন হঠাৎ রূপান্তরিত হয়েছে উদাসীনতা আর অজানা বিষণ্নতায়। কেন এমন কাঁদতে ইচ্ছে করছে হঠাৎ? কেন মনে হচ্ছে কী তুচ্ছ, কী অর্থহীন জীবনের সকল আয়োজন! কেন বুকের ভেতরটা এমন শূন্য মনে হচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে – কোথাও কেউ নেই তার, এই বিপুল বিশাল মহাবিশ্বে সে একা, নিঃসঙ্গ? হঠাৎ এই নিঃসঙ্গতার বোধ এমন তীব্র হয়ে উঠলো যে, সহ্য করতে না পেরে, অথবা ভয় পেয়ে অঞ্জনের হাত জড়িয়ে ধরলো শান্তা। অঞ্জনও একহাতে তাকে জড়িয়ে হাঁটতে থাকলো, মনে হলো – এখন তাদেরও শরীরে উদাসীনতা ঢেলে দেয়া হচ্ছে অজানা কোনো উৎস থেকে।

কিন্তু এই অনুভূতি দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখা গেলো না। বাড়ি ফিরে দেখা গেলো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব বসে আছেন দলবল নিয়ে। অঞ্জনকে দেখেই – কেমন আছো অঞ্জন, ভাই? কদ্দিন পর আইলা! দ্যাশ গাঁও ভুইলা থাকো ব্যামনে – বললেন অঞ্জন মৃদু হেসে শান্তাকে ভেতরে যাওয়ার জন্য ইশারা করে। এই লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সে শান্তাকে অপমান করতে চায় না। লোকটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে শোনার পর থেকে তার মন মেজাজ দুটোই খারাপ হয়ে আছে। আসার পর থেকেই বিরূপ সব পরিস্থিতি, তারপর আবার মূর্তিমান বিভীষিকার মতো এই লোক – অঞ্জনের অসহ্য বোধ হলো। লোকটাকে একান্তরে বা তার পরে কেন যে মুক্তিযোদ্ধারা ছেড়ে দিয়েছিলো, কে জানে! অঞ্জন ইচ্ছে করেই, তাকে বিব্রত অথবা অপমান করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তোলে। কিন্তু এতটুকু বিব্রত বা অপমানিত না হয়ে, বরং তাকেই উল্টো অপমান করে, যেন সে গর্বিত তার অতীত ভূমিকায় এই ভঙ্গিতে বলে – এইসব ডেড ইস্যু নিয়া আর কত দিন কথা বলবা? তোমার মরহুম পিতা, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় চাচাজানও সারাজীবন ধইরা খালি এইসব প্যাঁচাল পাইড়া গ্যালেন। কি লাভ হইলো এই সব বইলা? তুমি শহরে থাকো, বিদেশ-বিভুঁইয়ে বড়ো হইছো, দ্যাশের প্রকৃত অবস্থা জানো না, বোঝো না। তাই খালি আজেবাজে বিষয় নিয়া কথা বলো। আমি শুনছি – আমাগো পোলাপান আইছিলো, তাগোর সাথেও তুমি এইসব নিয়া তর্কাতর্কি করছো। শোনো ভাই অঞ্জন, মুক্তিযুদ্ধ-টুক্তিযুদ্ধ নিয়া কথা বইলা আর কোনো লাভ হইবো না। এই দ্যাশের মানুষ এখন অনেক সচেতন, এত সহজে তাগো বিভ্রান্ত করবার পারবা না। তুমি বেড়াইতে আসছো, থাকো, ঘুরো, ফিরো, কোনো অসুবিদা হইলে আমারে জানাইও, কিন্তু এইসব কথা বইলা মানুষরে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা কইরো না। – স্পষ্ট হুমকি, অঞ্জন টের পায়। অবস্থা তাহলে এই রকম ? তাকে হুমকি দেয়ার মতো সাহসও এরা অর্জন করে ফেলেছে? হঠাৎ একবার জ্বলে উঠতে চেয়েও সে থমকে যায়। না, এই লোকের সঙ্গে কোনো কথা বলাটাই অরুচিকর।

উদাসপুরে এবার সত্যি সন্ধ্যা নামে। এখানে আজ যেন দ্রুত অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। এখন না শুক্লপক্ষ? কিন্তু আকাশে চাঁদ কোথায়? সারা আকাশ জুড়ে এত মেঘ জমলো কখন?

অঞ্জনের মন খারাপ। সে কি তবে এই চিহ্নই দেখতে এসেছিলো? একজন মানুষও কি নেই এ তল্লাটে, যার সঙ্গে কথা বলে একটু শান্তি পাওয়া যাবে? আজ সারাদিন সে মনে মনে মাস্টার চাচাকে খুঁজেছে। কাল থেকে এত লোক এলো – অথচ তাঁর কোনো খোঁজই নেই। সারাদিনে অঞ্জনেরও সময় হলো না তাঁর বাড়িতে যাওয়ার। কিন্তু এখন মনে হলো, তাঁর সঙ্গে কথা বললে হয়তো ভালো লাগতো। বাবা খুব স্নেহ করতেন তাঁকে, খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি, প্রায়ই সেই গল্প শোনাতেন অঞ্জনকে। অঞ্জন শান্তাকে নিয়ে বেরোচ্ছিলো মাস্টার চাচার বাড়িতে যাওয়ার জন্য, ঠিক তখুনি তিনি এলেন – প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে। সেই চেহারা আর নেই তার, কেমন ক্লান্ত, ভেঙে যাওয়া, পরাজিত মুখচ্ছবি। এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিলো, কিন্তু এখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় অঞ্জন – আর কারও সঙ্গেই উদাসপুরের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবে না সে। মাস্টার চাচার সঙ্গেও নয়। সবকিছু যেভাবে পাল্টে গেছে – কে জানে, যদি তিনিও ...। বরং বাজারে মাছ পাওয়া যায় কেমন, কিংবা পদ্মা যে ভেঙেই চলেছে – এর কি কোনো প্রতিকার হবে না, কয়েক বছর পর তো এই বাড়িও ভেঙে যাবে, শুধু এই বাড়ি কেন পুরো উদাসপুরই পদ্মার পেটে যাবে – তখন কি উপায়? – এই ধরনের আলাপ করা যায়। অঞ্জন করেও তাই। মাস্টার চাচা টুকটাক উত্তর দেন, শান্তা নিজ হাতে চা বানিয়ে আনলে অভিভূত হয়ে বলেন – এই বাড়ির লোকগুলো যে ভালো হবে সে তো জানা কথাই, কিন্তু বউগুলোও এত ভালো জোটে কোত্থেকে বলো তো মা? – শান্তা লজ্জা পায়, কিন্তু কোনো কথা বলার আগেই অকস্মাৎ একটি তীক্ষ্ন হাসিতে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে গেলে – অঞ্জন শান্তা দুজনেই ভীষণ চমকে ওঠে। তারপর শোনা যায় নারী কণ্ঠের অসংলগ্ন চিৎকার। মাস্টার চাচাকে তবু ভাবলেশহীন দেখে অঞ্জন – কি ব্যাপার চাচা? – জিজ্ঞেস করলে তাঁর নির্লিপ্ত উত্তর পাওয়া যায় – রতনের মা।

রতনের মা?

রতনের মাকে তোমার মনে নেই?

হ্যাঁ, আছে তো। এখন কি একেবারেই পাগল হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। আগে থেকেই তো একটু সমস্যা ছিলো, তবে কম। একটু আধটু পাগলামী করতো – সে তো তুমিও দেখেছো। মাঝে মাঝে পাগলামীটা বাড়লে, গ্রামের মানুষ একটু বিরক্তই হতো। সেই অজুহাতে চেয়ারম্যান আর লোকজন রতনের রক্তমাখা শার্টটা পুড়িয়ে ফেলার পর মহিলা পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে।

অঞ্জনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো – রতনের শার্ট ওরা পুড়িয়ে ফেলেছে?

হ্যাঁ।

পুড়িয়ে ফেললো? আপনারা কিছুই বললেন না?

না, বললাম না। আমরা হচ্ছি পরাজিত জনতা – আমাদের কিছু বলতে নেই।

আপনারা পরাজিত? একাত্তরে আপনারা পরাজিত হয়েছিলেন?
না একাত্তরে হইনি, তার পরে হয়েছি। ওই লোকটাকে তো এই অঞ্চলের লোকজনই ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বানিয়েছে। অথচ একাত্তরে ও কি করেছে – সেটা তো কারোরই অজানা নয়। তবু কেন এমন হলো বলো? সেই সময়ের কথা মানুষ কি সব ভুলে গেছে? এ অঞ্চলে কি আর একজন লোকও ছিলো না যে ওর চেয়ে আর একটু ভালো? আমরা সবাই নিশ্চয়ই ওর চেয়ে খারাপ, নইলে মানুষ এ রকম লোককে ভোট দেবে কেন? এই যখন অবস্থা তারপরও তুমি বলবে যে, আমরা পরাজিত নই? – তাঁর কণ্ঠ থেকে দুঃখ, ক্ষোভ, কষ্ট ও বেদনা ঝরে পড়ে।

অঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যায়। বাবা বলতেন – মুক্তিযুদ্ধ রয়ে যাবে এদেশের মানুষের বুকের ভেতর। রতনের শার্ট দেখিয়ে বলেছিলেন – এই শার্ট, এই স্মৃতিচিহ্ন কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। নিয়েছে তো! আব্বু তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হলো! অঞ্জন রিক্ত, বিপন্ন, পীড়িত বোধ করতে থাকে। ভেতরে অনেক কান্না এসে জড়ো হয়। আর তখন দূর থেকে বিলম্বিত সুরে – রতন রে, ও রতন ... কান্না ভেসে আসে। যেন ওই কান্না ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত আকাশে, সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তব্ধ, বিমূঢ় কান্নাভেজা হয়ে উঠেছে – সেটা বোঝা যায়, যখন আকাশ ভেঙে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে আসে।

মাস্টার চাচার চোখ এখন ভেজা। অঞ্জনেরও চোখ ভিজে উঠলো; এমন কি শান্তারও – যে কেবল গতকালই রতন আর তার মা র কথা শুনেছে।